করুণা তোমায় কুন্তী

করুণা তোমায় কুন্তী

প্রবোধচন্দ্র সেন

মডার্ন কলাম
১০/২এ, টেমার লেন, কলকাতা-৭০০ ০০৯

KORUNA TOMAY KUNTI

A novel based on the Mahabharata

By Asim Chattopadhyay

প্রথম প্রকাশ : বৈশাখ ১৩৬৮

প্রকাশিকা : লতিকা সাহা। মডার্ন কলাম। ১০/২এ, টেমার লেন, কল-৯

মুদ্রাকর : গোপাল পাল। স্টার প্রিণ্টিং প্রেস। ২১/এ রাধানাথ বোস লেন কল-৬

প্রচ্ছদ : সুব্রত চৌধুরী

প্রাসঙ্গিক দু-চার কথা

এ উপন্যাস প্রসঙ্গে আমার প্রথম এবং প্রধান কথা একটাই : এভাবেও দেখা যায়।

কুন্তীকে নিয়ে একটা সুপরিচিত উপন্যাস আছে বাংলাভাষায়—শ্রদ্ধেয় কালকূট-এর 'পৃথা।' সে উপন্যাসে কুন্তীর প্রথম সন্তানের জনক হিসেবে কালকূট দেখতে চেয়েছেন সূর্যকে নয়, ঋষি দুর্বাসাকে। তাঁর এই দেখাটা একান্তই যুক্তিসম্মত মনে হয়েছে আমার। এ উপন্যাসে তাঁর মতটাই গ্রহণ করেছি আমি। কিন্তু তারপর কালকূট আর আমার পথ সম্পূর্ণ আলাদা হয়ে গেছে। হাঁটার চেষ্টা করেছি তাঁর পথের ঠিক উল্টোমুখী পথে। কেন করেছি, কোন্ যুক্তিতে—সে প্রসঙ্গে আসার আগে আরও কিছু কথা বলে নেওয়া দরকার।

ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্য পাণ্ডু নিজেই উদ্যোগী হয়েছিলেন, কুন্তীর দেবমিলনে পূর্ণ সম্মতি ছিল তাঁর—মহাভারত বলছে। কিন্তু তা-ই যদি হবে, তাহলে ঐ পুত্রদের কারুরই জন্মসংবাদ কেন হস্তিনায় পাঠালেন না পাণ্ডু? তাঁর মৃত্যুর পর পঞ্চপাণ্ডবের পরিচয় দিতে কেন আগ বাড়াতে হল কয়েকজন ব্রাহ্মণকে? সংশয়ের অবকাশ কিন্তু থেকেই গেছে, রয়ে গেছে একটা ফাঁক। উপন্যাস-লেখক তো সেই ফাঁকটুকু খুঁজবেই।

মাদ্রীর মৃত্যুও স্বাভাবিক নয়। স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করে প্রাণ বিসর্জন দিলেন তিনি—কথাটা খুব বিশ্বাসযোগ্য হয়ে উঠতে পারে নি। 'ভারবি' প্রকাশিত বর্ধমান রাজবাড়ির অনুবাদে আছে, পাণ্ডুর মৃত্যুর পরই তাঁর চিতাগ্নিতে প্রাণত্যাগ করেন মাদ্রী। খুবই বিশ্বাস্য বর্ণনা। কিন্তু ঠিক তার পরই বলা হচ্ছে—পাণ্ডু আর মাদ্রীর মৃতদেহ নিয়ে হস্তিনার দিকে যাত্রা করলেন ব্রাহ্মণরা, সঙ্গে কুন্তী আর পঞ্চপাণ্ডব। সতের দিন পর তাঁরা পৌঁছলেন হস্তিনায়। সেখানেই দাহ করা হল পাণ্ডু আর মাদ্রীর মৃতদেহ। এ কেমন পরস্পরবিরোধী বিবৃতি? মাদ্রীর মৃত্যুকে তাই স্বাভাবিক মৃত্যু হিসেবে মেনে নেওয়া সম্ভব হয় নি। খুঁজতে চেয়েছি ভিন্নতর ব্যাখ্যা।

দ্রৌপদীর প্রসঙ্গে আসা যাক। পঞ্চপুত্রের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিয়ে দেওয়ার কথা যে কুন্তীকে অনেক আগেই জানিয়ে গিয়েছিলেন বেদব্যাস, সে কথা মহাভারতেই আছে। তারপর নির্দিষ্ট দিনে পঞ্চপাণ্ডব গেলেন স্বয়ংবর-সভায়। আশ্রয়দাতা কুমোরের বাড়িতে একা রইলেন কুন্তী। ষোল দিনের দিন যে স্বয়ংবর, সে কথা

সারা পাঞ্চাল জানে। জানেন কুন্তীও। দ্রৌপদীকে নিয়ে অর্জুন আর ভীমসেন ঘরে ফেরার আগেই ফিরে এলেন যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেব, উদ্বিগ্না জননীকে নিশ্চিন্ত করার জন্য—এ বর্ণনাও মহাভারতেরই। তাহলে ? তাহলে দুয়ারের কাছ থেকে অর্জুন অথবা ভীমসেন যখন বললেন—মা, দ্যাখো, আজ ভিক্ষায় এক পরম রমণীয় রত্ন পেয়েছি আমরা, তখন কুন্তী কী করে বলতে পারেন—যা পেয়েছ তা পাঁচজনে সমবেত হয়ে ভোগ করো ? ঐ ভিক্ষা যে কী, তা তো অজানা ছিল না কুন্তীর ! অর্থাৎ, সব জেনেই কথাটা বলেছিলেন তিনি। কেন ? উত্তর খুঁজেছি এ উপন্যাসে।

দ্রৌপদীর স্বয়ংবর প্রসঙ্গে আর একটা কথা, ঠিক এ উপন্যাসের সঙ্গে সম্পর্কিত না হলেও, জানাই। স্বয়ংবর-সভায় কর্ণ যে ধনুকে জ্যা পরিয়ে লক্ষ্য প্রায় বিদ্ধ করে ফেলতে যাচ্ছিলেন, তা আজও গল্প হয়ে মানুষের মুখে মুখে ফেরে। হরিদাস সিদ্ধান্তবাগীশের অনুবাদ, কালীপ্রসন্ন সিংহের অনুবাদ, এমনকি রাজশেখর বসুর সারানুবাদেও উল্লেখ আছে এ ঘটনার। আশ্চর্য, ভারবি প্রকাশিত বর্ধমান রাজবাড়ির অনুবাদে কিন্তু ঘটনাটা একেবারেই বাদ ! শুধু আছে—সব রাজারা ব্যর্থ হওয়ার পর অর্জুন লক্ষ্যভেদ করেন। কর্ণ যদি সত্যিই ব্যর্থ হয়ে থাকেন আর দ্রৌপদী যদি তাঁকে সেই কুখ্যাত 'আমি সূতপুত্রকে বরণ করব না' কথাটা না বলে থাকেন (এ কথাটাও, স্বাভাবিকভাবেই, বর্ধমান রাজবাড়ির অনুবাদে নেই), তাহলে অনেক হিসেবই ওলোট-পালোট হয়ে যায় না কি ?

পান্ডবদের ইন্দ্রপ্রস্থে বস বাসের সমগ্র পর্যায়টা জুড়ে মহাভারতের পৃষ্ঠায় প্রায় খুঁজেই পাওয়া যায় না কুন্তীকে। সর্বস্ব পণ রেখে হস্তিনাপুরে পাশা খেলতে যাওয়ার সময়ও মায়ের কাছে অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন বোধ করেন নি তাঁর সাধের ছেলেরা। উপেক্ষা ?

ইচ্ছেমতো যে-কোন দেবতাকে আহ্বান করার মন্ত্র কুন্তীকে শিখিয়ে গিয়েছিলেন পরিতৃপ্ত দুর্বাসা। না, মন্ত্রের জোরে দূর-সুদূর থেকে কাউকে যখন-খুশি ডেকে আনা যায়, এ কথায় বিশ্বাস করার মতো কোন যুক্তি আমার জানা নেই। আসলে কোন লৌকিক উপায়ই কুন্তীকে জানিয়েছিলেন দুর্বাসা। কী সেই উপায় ? ভাবতে চেষ্টা করেছি নিজের মতো করে।

এবং, কর্ণ।

একদিনের কোন শিশুকে যদি ভাসিয়ে দেওয়া হয় নদীর জলে, একটা পেটিকায় ভরে, তাহলে চার চারটি নদী পেরিয়ে সুদূর কোন অঞ্চলে গিয়ে পৌঁছনো কি সম্ভব সেই শিশুর পক্ষে ? মানে, পৌঁছলেও, জীবিত অবস্থায়

পেঁছিনো সম্ভব কি ? কে তার মুখে তুলে দেবে জীবনদায়ী পানীয়টুকু ?

প্রশ্নটা শ্রদ্ধেয় কালকূটকেও ভাবিয়েছিল। সম্ভাব্য একটা উত্তরও খুঁজে বার করেছিলেন তিনি। মহাভারতে বনপর্বের শেষদিকে এ প্রসঙ্গে একটিমাত্র বাক্য আছে—ছেলেকে ভাসিয়ে দেওয়ার পর চরদের সাহায্যে তার সব খবর সংগ্রহ করেছিলেন কুন্তী। এই বাক্যটির সূত্র ধরেই এগিয়েছেন কালকূট। বলেছেন, আসলে কোন পেটিকা নয়, একটা নৌকোয় করে সদ্যোজাত ছেলেকে ভাসিয়েছিলেন কুন্তী, সেই নৌকো চালানো আর ঐ শিশুর পরিচর্যার জন্য লোক ছিল নৌকোয় ; তারাই ঐ শিশুকে পেঁছে দিয়ে এসেছিল চম্পানগরীতে অধিরথের কাছে—যে ব্যবস্থা আগে থেকেই করে রেখেছিলেন কুন্তী। ফলে তাঁর ঐ ছেলে অর্থাৎ কর্ণের সব খবর বরাবরই জানা ছিল তাঁর।

হতে পারে। আবার না-ও হতে পারে। আমি হাঁটতে চেষ্টা করেছি সেই না-হওয়ার পথেই। একমাত্র একজন ধাত্রী ছাড়া নিজের গর্ভসঞ্চারের খবর আর কাউকে জানাতে পারল না যে মেয়ে, লোকলজ্জায় যে পরিত্যাগ করল তার একদিনের সন্তানকে, সে গুপ্তচর বা ঐ-জাতীয় কয়েকজনের সামনে মেলে ধরবে নিজের একান্ত গোপন কথা—এমনটা মনে হয় না। বহুবছর পর রঙ্গভূমিতে কর্ণকে প্রথম দেখেই কী করে চিনলেন কুন্তী ? কর্ণ তো তখন রীতিমতো তরুণ। একদিনের শিশুর মুখের সঙ্গে সেই তরুণ মুখের কোন মিল নিশ্চয়ই ছিল না, থাকতে পারেও না। সহজাতকবচকুণ্ডল ? প্রথমত, জন্মের সময়ই কোন শিশুর শরীরে থাকে দুর্ভেদ্য বর্ম বা মূল্যবান কুণ্ডল—এটা গল্পেই সম্ভব। দ্বিতীয়ত, ছেলেকে ভাসিয়ে দেওয়ার সময় মঞ্জুষার মধ্যে কোন বর্ম বা কুণ্ডল দিয়ে থাকতে পারেন কুন্তী। কিংবা সেগুলো তাকে পরিয়েও দিয়ে থাকতে পারেন। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন থাকে—অতদিন পরে সেই বর্ম, সেই কুণ্ডলই কি ছিল কর্ণের শরীরে ? থাকা সম্ভব ছিল কি ? উত্তরে হ্যাঁ বা না, যে-কোনটাই বলা যায়। প্রশ্নটা বেছে নেওয়ার। আমি নিজের পথেই বাছার চেষ্টা করেছি।

লোকে বলে, জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র অন্ধ ছিলেন পুত্রস্নেহেও। আমি দেখেছি, পুত্রস্নেহে অন্ধ কুন্তীও।

সব মিলিয়ে কুন্তীকে এক আশ্চর্য বিষাদময়ী নারী বলেই মনে হয়েছে আমার। অবশ্য, মহাভারতের প্রায় প্রতিটা প্রধান চরিত্রই তাদের নিজস্ব দৃষ্টি-কোণ অনুযায়ী শেষ বিচারে বিষাদী চরিত্রই।

কৈফিয়ৎ শেষ।

শ্রদ্ধেয় কালকূট-এর ঋণটুকু আগেই স্বীকার করেছি ঃ দুর্বাসাই যে কুন্তীর প্রথম সন্তানের জনক, এ ভাবনাটা তাঁর কাছ থেকেই পাওয়া। আর আমার

তিন অন্তরঙ্গ সুহৃদ, সুদীপ্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, সৈকত গুহ, সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়—এদের ভূমিকা শুধু এ লেখার ক্ষেত্রেই নয়, আমার সংক্ষিপ্ত লেখক-জীবনের সবটা জুড়েই রয়ে গেছে এদের অজস্র অবদান। সেগুলোর কোনটাই ঋণ নয়, আমাদের বন্ধুত্বেরই অনিবার্য ফসল। কাজেই কৃতজ্ঞতা-টৃতজ্ঞতা জানানোর প্রশ্নই ওঠে না। আর সহদেবদা, মডার্ন কলাম প্রকাশনার পরামর্শ-দাতা সহদেব সাহা। এক আশ্চর্য ভালবাসার বাঁধনে বেঁধেছেন তিনি আমাকে। কৃতজ্ঞতা নয়, আমার শ্রদ্ধাটুকুই থাক।

গত বছর, 'স্বনামে দুর্জন দুর্যোধন' প্রকাশিত হওয়ার পর পাঠকদের কাছ থেকে পেয়েছি কিছু প্রশংসা, কিছু সমালোচনা, কিছু বুদ্ধিদীপ্ত প্রশ্ন। সবটাই লেখক জীবনের ন্যায্য পাওনা, হয়ত বাঞ্ছিতও। এ উপন্যাস পাঠকদের কেমন লাগল, জানার অপেক্ষায় থাকব।

১

নিজেকে আর সংবরণ করতে পারলেন না মুনি দুর্বাসা। উঠে বসলেন শয্যায়। পদসেবায় রত কিশোরী মেয়েটি বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করল, কী হল মুনিবর? হঠাৎ এমন চঞ্চল হয়ে উঠলেন কেন?

কিশোরীর দিকে একটু ঝুঁকে পড়লেন দুর্বাসা, আমার এ চাঞ্চল্যের কারণ কি তুমি বুঝতে পারছো না, কুন্তী?

ডাগর চোখ দুটো তুলে দুর্বাসার মুখের দিকে তাকাল কুন্তী। উজ্জ্বলবর্ণ, সুঠামদেহী এক পুরুষ, গুম্ফশ্মশ্রুতে ভরা মুখমণ্ডলে উত্তেজনার আঁকিবুকি, অন্তর্ভেদী দুই চোখে উন্মুখ কামনা। কিশোরী কুন্তীর জীবনে আজও কোন পুরুষের ছায়া না পড়লেও, এ চোখ তার অচেনা নয়। এই নির্জন অবসরে কিসের প্রত্যাশা ওই চোখে, বুঝতে অসুবিধে হয় না। আর বোঝা মাত্রই, এক আশ্চর্য শিহরণে কেঁপে ওঠে কুন্তী। এই সুবাস-ছড়ানো প্রায়ান্ধকার প্রকোষ্ঠ, এই কোমল শয্যা, হাওয়ায় হাওয়ায় কি-এক আকুল ইশারা, আর সামনে, মুখের একেবারে কাছে, এক বলিষ্ঠ পুরুষের কামনাচঞ্চল চাহনি। নেশা ছড়ায় কুন্তীর শরীরে।

দুর্বাসা ডাকেন, কুন্তী!

ক্ষীণ স্বর ফোটে কিশোরীর গলায়, বলুন মুনিবর।

দুর্বাসা বলেন, তোমার হাতের স্পর্শ আমাকে অধীর করেছে, কুন্তী। আমাকে তুমি তৃপ্ত করো।

কুন্তীর শিরায় শিরায় রক্তের প্রবল উচ্ছ্বাস, সত্তার মর্মমূল জুড়ে কামনার দুর্নিবার চলাচল। তবু, নিঃসঙ্কোচে নিজেকে

উজাড় করে দিতে পারে না কিশোরী মেয়েটি। চোখ দুটি নামিয়ে নিয়ে প্রশ্ন করে, কিন্তু মুনিবর, পিতামাতা বর্তমান থাকতে নিজেকে স্বেচ্ছায় কারুর হাতে তুলে দেওয়ার অধিকার কি আছে আমার? বিবাহহীন এই মিলনে কি আমাদের বংশের অগৌরব হবে না?

দুর্বাসা, অস্থির, বললেন—না কুন্তী, তোমার পিতামাতা কিংবা অন্য গুরুজনরা তোমার প্রভু নন। অবিবাহিতা মেয়েরা নিজেদের ইচ্ছামতো যে-কোন পুরুষকেই গ্রহণ করতে পারে। কন্যা স্বতন্ত্রা, পরতন্ত্রা নয়। তাছাড়া, নিজের ইচ্ছা অনুসারে কাজ করাটাই তো স্বাভাবিকতা, সুস্থতা। বিবাহাদি নীতি মানুষের কল্পনামাত্র। কাজেই আমার সঙ্গে মিলনে তোমার বা তোমার বংশের কোন অগৌরব হওয়ার আশঙ্কা নেই। প্রশ্ন শুধু একটাই —তুমি নিজে আমার সঙ্গে মিলিত হতে চাও কি না।

দৃঢ়চেতা কিশোরীর আনত মুখমণ্ডলে লজ্জার সিঁদুররঙ আভা। বলিষ্ঠ দুই হাতে কুন্তীকে বুকের কাছে টেনে আনলেন দুর্বাসা, চুম্বন করলেন কুন্তীর ওষ্ঠাধরে। কুন্তীর গলন্ত চেতনায় ফুঁসে-ওঠা মহাসমুদ্রের গর্জন। সমাজ-সংসার পলাতক। শরীর ঘিরে শুধু এক পুরুষের বাহুর শৃঙ্খল আর এক অনাস্বাদিত সুখের অবাধ উপস্থিতি।

উঠে বসলেন পরিতৃপ্ত দুর্বাসা। বসন সংবৃত করে উঠে বসল কুন্তীও। দুর্বাসা বললেন, তুমি আজ আমাকে পরম সুখ দিয়েছো, কুন্তী। বলো, কী বর চাও তুমি?

অন্ধকারে মুখ ফেরালো কুন্তী। বর? কী বর চাইবে সে? এ জীবনে যা হতে পারত শ্রেষ্ঠ সম্পদ—পিতার স্নেহচ্ছায়া—তা থেকে তো ও বঞ্চিত সেই বিস্মৃত শৈশবেই। বৃষ্ণিরাজ শূরসেন তাঁর কন্যা পৃথাকে প্রায় জন্মলগ্নেই তুলে দিয়েছিলেন কুন্তিভোজের হাতে। কুন্তিভোজের পালিতা-কন্যা পরিচিতা হয় কুন্তী নামে। কিন্তু কেন পিতা শূরসেন তাকে তুলে দিয়েছিলেন অন্যের হাতে?

তার অন্য কন্যারা, পৃথুকীর্তি, শ্রুতদেবা, শ্রুতশ্রবা—এদের তো হারাতে হয় নি পিতার আশ্রয় ! কেন তবে একমাত্র তাকেই হারাতে হয়েছে সেই অনেক-চাওয়া স্নেহের ছায়া, কেন প্রতিপালিত হতে হয়েছে পরের আশ্রয়ে, যেখানে স্বাচ্ছন্দ্য থকেলেও নেই কোন পরম নির্ভর, প্রতিষ্ঠা থাকলেও নিরন্তর ঘিরে থাকে অধিকারহীনতার মেঘ—কেন ? বর ? না, পিতার আশ্রয় আর ফিরে চাইবে না কুন্তী। তাহলে ?

সদ্য মিলনতৃপ্তা কুন্তীর মন-আকাশে কিছু অনেক-শোনা কাঙ্খিত পুরুষের ছবি ভেসে ওঠে। সেই দৃপ্ত, সবল, সুন্দর পুরুষরা, যারা দেবতা নামে চিহ্নিত। এই সুখ, শরীরের প্রতি কোষে ছড়িয়ে-পড়া এই আশ্চর্য স্বাদ···সেইসব মোহন পুরুষ ·· শিহরিত তনুলতায় তাদের স্পর্শ, গভীর, গভীর···

পূর্ণদৃষ্টিতে দুর্বাসার দিকে তাকায় কুন্তী, মুনিবর, যদি সত্যিই বর দিতে চান, তাহলে এই বর দিন যে আমি যেন ইচ্ছামতো যে-কোন দেবতাকে ডাকতে পারি।

নারীমনের রহস্য দুর্বাসার অজানা। মুনিবর বিস্মিত, এ কেমন অদ্ভুত বর, কুন্তী ? দেবতাদের ডাকতে চাও কেন ?

আহ্, অনভিজ্ঞ পুরুষ ! কোন নারী, বিশেষত সদ্য কৌমার্য-হারা কিশোরী, পারে এ প্রশ্নের উত্তর দিতে ? বাতায়নের বাইরে চোখ রেখে কুন্তী বলে, আমি···দেবতাদের···চাই···

থমকে যান দুর্বাসা। অনভিজ্ঞ হলেও এই কিশোরীর সুপ্ত আকাঙ্ক্ষাটা যেন একটু একটু করে ফুটে উঠছে তাঁর চোখের সামনে। কুন্তীর কাঁধে হাত রাখেন তিনি, বলেন—তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হবে, কুন্তী। যখন খুশি দেবগোষ্ঠীর সঙ্গে যাতে যোগাযোগ করতে পারো তুমি, তার উপায় আমি বলে দেবো তোমাকে। তোমার ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে আসবেন দেবগোষ্ঠীর পুরুষরা। আসার পর···না, আর কিছুর প্রয়োজন হবে না। তোমার রূপ-লাবণ্য আর এই অপূর্ব দেহসুষমাই বাকি কাজটুকু করে দেবে।

কিশোরী কুন্তী লাজরাঙা।

দেবগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের উপায় বলে দেন দুর্বাসা ঃ প্রথমে যোগাযোগ করতে হবে নারদদের সঙ্গে। নারদ একজন নন, বহু। উন্নত দেবগোষ্ঠীর সঙ্গে অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষার যোগসূত্র এঁরাই। এই নারদরা সারাক্ষণই ঘুরে বেড়ান দেশের সর্বত্র। এঁদের যে-কোন একজনের সঙ্গে যোগাযোগ করে দেখাতে হবে দুর্বাসাপ্রদত্ত অভিজ্ঞান ঃ একটি বিশেষ কুণ্ডল। এই অভিজ্ঞানই হবে দেবতাদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যাপারে কুন্তীর ছাড়পত্র। কুণ্ডলটি দেখিয়ে যে দেবতা পুরুষটিকে সংবাদ দিতে বলবে কুন্তী, নারদরা যত দ্রুত সম্ভব সংবাদ পেঁছে দেবেন সেই পুরুষের কাছে। আসবেন তাঁরা। শেষ দায়িত্বটুকু কুন্তীর, তার শরীরী বিভঙ্গ, ফুটন্ত যৌবনের দুর্বার আকর্ষণ...

জীবনের প্রথম পুরুষটির হাত থেকে ভবিষ্যতের ছাড়পত্র সেই কুণ্ডলটি গ্রহণ করে, বেরিয়ে এল কুন্তী। পরিতৃপ্ত, সুখডুবো।

দুর্বাসা চলে গেছেন অনেক দিন। রাজা কুন্তিভোজ বারবার প্রশ্ন করেছিলেন মাননীয় অতিথিটিকে, আমার কন্যার পরিচর্যায় আপনি সন্তুষ্ট তো, মুনিবর? কোন অসুবিধে হয়নি তো আপনার?

পরম তৃপ্তির হাসি ভাসিয়ে দুর্বাসা উত্তর দিয়েছেন, নিশ্চিন্ত থাকুন রাজন্, বিন্দুমাত্র অসুবিধে হয় নি আমার। এক আশ্চর্য কন্যারত্ন লাভ করেছেন আপনি। আমি তৃপ্ত।

চলে গেছেন দুর্বাসা। রাজা কুন্তিভোজ সকলের কাছে পঞ্চমুখে প্রশংসা করেছেন তাঁর পালিতা কন্যাটির। সেবাপরায়না কিশোরী কুন্তীর গুণপনায় মুগ্ধ হয়েছে মানুষ।

আর দিনে দিনে, আতঙ্কিত বিস্ময়ে, কিশোরী মেয়েটি উপলব্ধি করেছে এক সুখজড়ানো ভয়াল সত্য ঃ সে সন্তানসম্ভবা! নতুন কোন প্রাণের স্পন্দন তার গর্ভে!

জীবনের প্রথম মিলনের স্বাক্ষর। নিজের শরীর চিরে, অস্তিত্বের নিবিড় উৎস থেকে পৃথিবীর মাটিতে এক প্রাণের উন্মেষ ঘটানো। নারীত্বের চিরন্তন স্বপ্নে কুন্তীর চেতনায় তোলপাড় তোলপাড় আর তার আড়াল থেকে এক ঘোরকালো আতঙ্কের জাগরণ : কুমারীত্ব, সন্তান, কলঙ্ক। এ সন্তান সমাজস্বীকৃত বিবাহের ফসল নয়, বিবাহহীন সহবাসের অবৈধ প্রস্ফুটন।

কুমারী অবস্থায় সন্তানবতী হওয়া যে একসময় নিতান্তই সাধারণ ঘটনা ছিল, তা শুনেছে কুন্তী। এখনও যে কুমারী-মাতৃত্ব সমাজে একেবারে বিরল নয়, তা-ও ওর জানা। এমনকি কানীন অর্থাৎ কোন নারীর কুমারী অবস্থায় প্রসূত সন্তানকেও সেই নারীর স্বামী অনেক সময় নিজের সন্তান হিসেবেই গ্রহণ করে থাকে। উত্তরকুরুর নারীরা তো এখনও স্বাধীনভাবেই পুরুষ-সংসর্গের অধিকারিণী।

হ্যাঁ, এ-সব কুন্তীর জানা। তবু, মনের গভীরে নিয়ত দোলাচল : আমি রাজকুমারী, এ কলঙ্ক আমার শোভা পায় না। জনক শূরসেনের কলঙ্ক, পালক-পিতা কুন্তিভোজের কলঙ্ক— না, এ সন্তানকে আপন সন্তানের স্বীকৃতি দিতে পারে না কুন্তী।

কিন্তু, এ-কথা কার কাছে বলবে ও? ঘাস, জল, জমে-থাকা মেঘেদের কাছে? আকাশে ডানা-মেলা কোন স্বাধীন পাখিকে? বলা যায়, এদের কাছে বলে যাওয়া যায় এই গোপন, গর্ভজোড়া সুখ-বিষাদের অ-রূপকথা। কিন্তু, আবার, আবার সেই ভয়ঙ্কর কিন্তুর ফণাবিস্তার—তারাও যে অসহায়! তারা সব শুনতে পারে কুমারীমনের ব্যথার কথা, হয়ত বুঝতেও, তার বেশি তো নয়। অন্য কাউকে চাই, কোন বিশ্বাসীজনকে, যে পারে মুক্তি দিতে, যার হাতে আছে ফাঁস এড়ানোর জাদুদণ্ড।

অনেক ভেবেচিন্তে এক বিশ্বাসী ধাত্রীর কাছে সব কথা খুলে বলল কুন্তী। ধাত্রীটি শুনল সব, কিন্তু চমকাল না এতটুকুও। জীবনে এমন বহু ঘটনা দেখেছে সে, বিস্তর অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধ তার

ঝুলি। সব শুনে সে শুধু বলল—অসুখের ছল করে নিজের কক্ষ থেকে একদম বার হবেন না, রাজকুমারী। আমি নিয়মিত দেখে যাব আপনাকে। উপযুক্ত সময় এলে যা করার আমিই করব। নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি।

ঘরের বাইরে পা রাখে না কুন্তী। মানুষের চোখের আড়ালে তার গর্ভে দিনে দিনে পুষ্ট হয়, বেড়ে ওঠে এক ভ্রূণ। রাজা কুন্তিভোজ জানেন—পালিতা-কন্যাটি অসুস্থ।

অবশেষে, সেই দিন। রাতের আঁধারে কুমারী কিশোরীর শরীর চিরে পৃথিবীর মাটিতে নেমে আসে এক মানবশিশু ঃ একটি পুত্রসন্তান। নিপুণ হাতে কাজ সারে অভিজ্ঞ ধাত্রী। ক্লান্ত, বিধ্বস্ত, সদ্যজননী পৃথা প্রশ্ন করে, এবার ?

ব্যবস্থা করা ছিল আগে থেকেই। মোম দিয়ে ঢাকা একটি মঞ্জুষায় সদ্যোজাত শিশুটিকে শুইয়ে, অশ্বনদীর স্রোতে মঞ্জুষাটি ভাসিয়ে দিল অসহায়া জননী। বোধহীন শিশুটি ভেসে গেল কাল-স্রোতে, অন্ধকারে, কয়েক মুহূর্তের জীবন থেকে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে। কুন্তীর অশ্রুধারা হারিয়ে গেল অশ্বনদীর জলস্রোতে।

২

হস্তিনাপুর উদ্বেল। বিশাল সৈন্যবাহিনী সহ নৃপতি পাণ্ডু এগিয়ে আসছেন হস্তিনাপুরের দিকে, সঙ্গে আসছেন তাঁর সদ্য-পরিণীতা বধূ। বধূবরণের জন্য নগরসীমান্তে উপস্থিত হয়েছেন তাত ভীষ্ম স্বয়ং, এসেছেন পাণ্ডুভ্রাতা বিদুর, কুলগুরু কৃপাচার্য। প্রাসাদ-তোরণে এসে দাঁড়িয়েছেন পিতামহী সত্যবতী, রাজমাতা অম্বালিকা। প্রাসাদের যাবতীয় প্রহরী, সূপকার, সূত, মাগধ, নর্তকীরাও বধূদর্শনের জন্য উন্মুখ।

শুধু, বিশাল প্রাসাদের দুটি কক্ষে, বিষাদের প্লাবনে—আনন্দের ফাঁকে ফাঁকে চুপি চুপি মাথা তোলে বিষাদ—নিমগ্ন তিনজন মানুষ। একটি কক্ষে, বিশাল শূন্যতার মাঝে একাকিনী

এক নারী, বর্ষীয়সী, বিধবা ঃ পাণ্ডুজননী অম্বালিকার জ্যেষ্ঠা ভগিনী, বিচিত্রবীর্যজায়া অম্বিকা। অপর কক্ষটিতে একজন পুরুষ, অপরজন নারী। পুরুষটি ধৃতরাষ্ট্র, নরপতি পাণ্ডুর অগ্রজ, অম্বিকাপুত্র। আর নারীটি তাঁর স্ত্রী, গান্ধার রাজদুহিতা গান্ধারী।

অম্বিকার দু'চোখে অবিরাম জলপ্রপাত। তাঁর পুত্র, জন্মসূত্রে পাণ্ডুর অগ্রজ হয়েও, সিংহাসনের অধিকারী নয়। স্বামীসহবাসে সন্তানবতী হতে পারেন নি অম্বিকা-অম্বালিকা। অপুত্রক অবস্থাতেই মারা গিয়েছিলেন রাজা বিচিত্রবীর্য। নিরুপায় রাজমাতা সত্যবতী তখন আহ্বান করেছিলেন তাঁর কানীন পুত্র সুপণ্ডিত কৃষ্ণদ্বৈপায়নকে। বিধবা অম্বিকা-অম্বালিকার গর্ভে কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জন্ম দিয়েছিলেন দুটি পুত্রসন্তানের ঃ ধৃতরাষ্ট্র আর পাণ্ডু। কিন্তু, হয়ত অমোঘ নিয়তি অথবা নিষ্ঠুর ভবিতব্য, কোন পূর্ণাঙ্গ মানবশিশুর জন্ম দিতে পারেন নি অম্বিকা। তাঁর গর্ভ চিরে বেরিয়ে এসেছিল যে শিশু, সে কোনদিন জানতে পারে নি কেমন দেখতে ঐ প্রদীপ্ত সূর্যকে, সন্ধ্যার মোহনায় নীড়মুখী পাখির সারি কত সুন্দর, কত গভীর তার জন্মদাত্রীর চোখে ভালবাসার রঙ, কী আশ্চর্য বর্ণময় এই পৃথিবীর মাটি, ঘাস, জলরাশি। কিছুই দেখে নি সেই শিশু, কোনদিন না, কারণ অম্বিকা জন্ম দিয়েছিলেন এক জন্মান্ধ শিশুর, নাম যার ধৃতরাষ্ট্র, জ্যেষ্ঠ হয়েও শুধু এই প্রতিবন্ধীত্বের অভিশাপে যে অধিকার পায় নি রাজপদে। রাজা হয়েছেন কনিষ্ঠ পাণ্ডু। আর আজ, সুখের উৎসমুখ ছিঁড়ে গভীর রক্তক্ষরণ অম্বিকার বুকে, আজ পাণ্ডু ফিরছেন সস্ত্রীক, স্বয়ংবর-সভা থেকে ভোজনন্দিনী কুন্তীকে জয় করে। সন্তানের মুখ দেখবে কুরুবংশ। পিতা হবেন পাণ্ডু, পিতা হবেন তাঁর পুত্র ধৃতরাষ্ট্রও। হায় অনাগত বংশধর, তুমি, এ বংশের জ্যেষ্ঠ পুরুষটির আত্মজ হওয়া সত্ত্বেও, বঞ্চিত হবে সিংহাসনে, যেহেতু তোমার পিতা রাজা নন, এক হতভাগ্য জন্মান্ধ পুরুষ মাত্র।

আহ্!

বস্ত্রপ্রান্তে চোখের জল মুছে ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন অম্বিকা। আজ কুরুবংশের এই শুভক্ষণে এভাবে চোখের জল ফেলা তাঁর শোভা পায় না। তাছাড়া, বধূবরণে তাঁর অনুপস্থিতিটাও চোখে পড়বে সকলের। নিজেকে সংযত করে কক্ষ থেকে বেরিয়ে এলেন অম্বিকা।

অপর কক্ষটিতে দৃষ্টিহীন আঁখি মেলে বসেছিলেন নির্বাক ধৃতরাষ্ট্র। সামনে তাঁর স্ত্রী গান্ধারী, অনচ্ছ বস্ত্রে আচ্ছাদিত দুটি চোখ। গান্ধারী বলছিলেন, উঠুন আর্যপুত্র, মেনে নিন ভবিতব্যকে। আপনার অনুজ আসছে স্ত্রী নিয়ে, তাকে স্বাগত জানানো আমাদের কর্তব্য।

দৃষ্টিহীন মানুষটির গলায় ব্যথার ছোঁয়া, জানি গান্ধারী, জানি। পাণ্ডুকে আমি কতটা স্নেহ করি, তা তো অজানা নয় তোমার। তবু···আহ্, গান্ধারী···আমাদের সন্তানরা কোনদিন···

গান্ধারী স্থির, জানি আর্যপুত্র, আমাদের সন্তানরা কোনদিন সিংহাসনের অধিকারী হতে পারবে না। কিন্তু আর্যপুত্র, মানুষের জীবনে সিংহাসনই তো শেষ কথা নয়! রাজসিংহাসনের থেকে অনেক বেশি মূল্যবান অজস্র সম্পদ তো ছড়িয়ে রয়েছে পৃথিবীময়। আমাদের সন্তানদের আমরা শেখাবো সেইসব অমূল্য সম্পদ চিনে নিতে।

গলার স্বর লক্ষ্য করে স্ত্রীর দিকে মুখ ফেরালেন ধৃতরাষ্ট্র। তাঁর এই মুখ ফেরানোয় স্ত্রীর চোখের দিকে অপলক তাকানোর আর্তি ছিল, অনন্ত মহাশূন্যকে দৃষ্টিসীমায় ঘিরে নেওয়ার আকুলতা ছিল। সেই আর্তি অথবা আকুলতাটুকু বুকেই শুকোয়। ধৃতরাষ্ট্রের জীবনে গান্ধারী খুব বেশি দিন আসেন নি। মাত্র কিছুদিন আগে বিবাহ হয়েছে তাঁদের। তবু, এই অল্প সময়েই, তরুণী ভার্যাটি বারবার বিস্মিত করেছে জন্মান্ধ যুবকটিকে। আজ আরও একবার বিস্মিত হলেন ধৃতরাষ্ট্র—স্ত্রীর প্রজ্ঞায়,

মননের গভীরতায়। ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন ধৃতরাষ্ট্র। বললেন, পরিচারিকাদের ডাকো গান্ধারী, নববধূকে আবাহন করতে যেতে হবে।

শ্বশুরালয়ে পা রাখার সময় থেকেই গভীর কৌতূহলে উপস্থিত মানুষগুলিকে দেখছিলেন কুন্তী। দেখছিলেন ভীষ্মকে, সেই অনেক-শোনা আশ্চর্য মানুষ। কি অমেয় ত্যাগ এই পুরুষটির! দেখছিলেন পিতামহী সত্যবতীকে, শ্বশ্রূমাতাদের। সেইসঙ্গে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্র, বদ্ধনয়না গান্ধারীকেও।

এবং, আর একজন। এক সদ্যযুবক। প্রাণবন্ত, স্থিতধী। দুই গভীর চোখে কোন দূর-সুদূরের নীলাভ ছায়া। সেই ছায়ার কোন প্রত্যন্ত প্রদেশে, অনুভব করেছেন কুন্তী, সহস্র সূর্যের উদ্দীপন, এক আশ্চর্য আলো। সে আলো ঘিরে রাখে কুন্তীকে, ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায়, আলোকিত করে। স্বামী পাণ্ডুর চোখেও আলোর বিচ্ছুরণ দেখেছেন কুন্তী, রাতের সুখসঙ্গে সমস্ত শরীর জুড়ে পেয়েছেন নিবিড় পরশ। তৃপ্তি, আবেশ। তৃপ্তি আর আবেশ আর এক অবুঝ হাহাকার। স্বামীর হাতের ছোঁয়ায় কোমলতার চেয়ে আবিলতা বেশি, চোখের উষ্ণ আলোয় প্রেম পরাজিত কামের কাছে। শূন্যতার প্রতিধ্বনি কুন্তীর বুকে। স্বয়ংবর-সভায় অসংখ্য রাজপুরুষের মধ্যে থেকে তিনি বেছে নিয়েছিলেন হস্তিনা-রাজ পাণ্ডুকেই, কারণ এই পুরুষকে দেখে তাঁর তরুণী মনে কাঁপন জেগেছিল, চোখে ঘনিয়েছিল স্বপ্নবরণ ঘোর, আর, ভুল, সুমেরু-সমান ভুল, ওই পুরুষের দৃষ্টিপাতেও অনুরাগের রশ্মি দেখে-ছিলেন তিনি। কয়েকদিনের বিবাহিত জীবনেই ভেঙেছে সেই ভুল, প্রেমহীন কামনার পরশে তৃপ্ত হয়েও শূন্যতায় ডুবেছেন কুন্তী। শুধু, অসীম অন্তহীন শূন্য প্রান্তরে, অস্তিত্ব-পোড়ানো অসহ্য রোদকে প্রতিরোধ করে ছড়িয়ে আছে একটুখানি নীলাভ ছায়া, একটি গাছ, প্রাণবন্ত, স্থিতধী। এই সদ্যযুবক তাঁর স্বামী

পাণ্ডুর বৈমাত্রেয় ভ্রাতা, পিতা কৃষ্ণদ্বৈপায়ন, মাতা এক শূদ্রাণী। নাম তাঁর বিদুর।

অপ্রেম-হাহাকার-শূন্যতার হিম-অন্ধকারে তবু একটু উষ্ণ স্বাদঃ এক পুরুষ শুধুই আমার। হস্তিনারাজ পাণ্ডু একমাত্র কুন্তীরই, যেভাবেই হোন, যে রূপেই হোন।

সেদিন, বাইরে এতোল-বেতোল ঝড়, পনস-দেবদারু-শিংশপার শাখায় শাখায় উতল নাচন, অপরাহ্নেই পলাতক দিন—তরুণী কুন্তীর একমাত্র বাতিটি নিভিয়ে দিলেন পাণ্ডু।

কক্ষের একটি বাতায়ন একটুখানি খুলে প্রকৃতির শরীরী আক্ষেপ দেখছিলেন কুন্তী। হয়ত বৃষ্টি হবে। এখন শুধুই ঝড়। ঠাণ্ডা হাওয়া। গাছগুলো মাটি ছুঁতে চাইছে। পাখিগুলো কোথায়?

কী দেখছ, প্রিয়ে?

পরিচিত কণ্ঠস্বর শুনে পিছু ফিরলেন কুন্তী। পাণ্ডু এসে দাঁড়িয়েছেন পিছনে। হাসি ভাঙল কুন্তীর ওষ্ঠপ্রান্তে, প্রকৃতির খ্যাপা রূপ দেখছিলাম, আর্যপুত্র।

ওই দেবীটি যে কখন খ্যাপেন আর কখন স্নিগ্ধ হয়ে ওঠেন মমতায়, দেবা ন জানন্তি। বলতে বলতে পালঙ্কে বসলেন পাণ্ডু, এদিকে এসো, কুন্তী। কথা আছে।

পায়ে পায়ে এগিয়ে গেলেন কুন্তী। স্থির হয়ে দাঁড়ালেন স্বামীর সামনে। দীপদানে দীপ জ্বলছে। সেদিকে তাকালেন পাণ্ডু। দীপশিখা কাঁপছে। একটু যেন ইতস্তত করলেন পাণ্ডু। তারপর বলছেন, জ্যেষ্ঠ তাত আমার আর একটি বিবাহ দিতে মনস্থ করেছেন, কুন্তী।

দমকা হাওয়ার ঝাপটে পলকে নিভে গেল বাতিটা। অন্ধকার, জমাট, শ্বাসরোধী। দীপদানের দিকে তাকালেন কুন্তী। না, দীপ তো নেভে নি। তার আভায় কক্ষে এখনও আলো। নিভেছে

সেই বাতিটি, একমাত্র, কুন্তীর বুকের গভীরে যা আলো ছড়াত অণুক্ষণ। তাই অন্ধকার, তাই আলোর আকাল। সহসা কুন্তীর চেতনায় ঝাঁপিয়ে পড়ল অশ্বনদী, তীব্র স্রোত আর সেই স্রোতের টানে অসহায় ভেসে যাওয়া এক মানবশিশু, তার কান্না, শেষ মুহূর্তের···কেমন ছিল সেই শিশুর মুখ, আজ আর মনে পড়ে না কুন্তীর। শুধু, হঠাৎ কখনও, জ্বালার অনন্ত আকর হয়ে চেতনায় ছিটকে ওঠে সেই কান্না।

পাণ্ডু বললেন, কয়েকদিনের মধ্যেই মদ্ররাজ্যে যাবেন জ্যেষ্ঠ তাত। মদ্ররাজ্য থেকেই কন্যা আনতে চান তিনি।

কুন্তী নিরুত্তর। যন্ত্রণা কিংবা আলো-নেভা সত্ত্বেও, তিনি জানেন,এ কোন নতুন ঘটনা নয়। রাজা-রাজড়ারা একাধিক বিবাহই করে থাকেন। এই কুরুবংশেও তো এ রীতি যথেষ্টই চালু। পাণ্ডুপিতা বিচিত্রবীর্যের দুই স্ত্রী, অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্রও একাধিক দার-পরিগ্রহ করেছেন। জানেন, কুন্তী জানেন সবই। তবু, একান্তই নারীমন যন্ত্রণায় দগ্ধায়।

স্ত্রীকে কাছে টানেন পাণ্ডু, চিন্তিত হয়ো না, প্রিয়ে। যে-ই আসুক, জেনে রাখো, তোমার আসন তোমারই থাকবে।

৩

খুশির হাওয়ার মধ্যেই লুকিয়েছিল বিষণ্ণতার বীজ। দিগ্বিজয়ে বেরিয়েছিলেন মহারাজ পাণ্ডু। দশার্ণ, মগধ, মিথিলা, কাশী, সুহ্ম, পুণ্ড্রদেশ জয় করে, অজস্র সোনারুপো, মনিমুক্তো, গো, অশ্ব, হস্তী, মহিষ প্রভৃতি আহরণ করে, হস্তিনাপুরে ফিরেছিলেন দিগ্বিজয়ী মহারাজ। গর্বে আর খুশিতে উছলে উঠেছিল হস্তিনাপুর। যজ্ঞ করেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। কিন্তু মাত্র কয়েকদিনের মধ্যেই এই গর্ব আর খুশির অজানা কোটর থেকে বেরিয়ে এল একটি বিষণ্ণতার গুটিপোকা; কারণ মহারাজ পাণ্ডু ঘোষণা করলেন—দুই মহিষীকে সঙ্গে নিয়ে বনবিহারে যাবেন তিনি। না, চিরদিনের

জন্য নয়, তবে বেশ কিছুদিন তিনি বাস করতে চান অরণ্যের নির্জনতায়।

সেদিন হস্তিনাপুর মন-ভাঙা। রাত মাঝপথে। পাণ্ডু তাঁর দ্বিতীয়া পত্নীর কক্ষে, গভীর ঘুমে কিংবা সুখ অথবা সুখহীনতার কোন গূঢ় পরীক্ষায় নিমগ্ন।

ঠিক এমনি সময়ে মহারাণী কুন্তীর শয়নকক্ষের পিছনের দ্বার দিয়ে কক্ষে প্রবেশ করল তাঁর একান্ত বিশ্বস্ত পরিচারিকা। কুন্তী জেগেই ছিলেন। অনুসন্ধিৎসু চোখে পরিচারিকার দিকে তাকালেন তিনি। পরিচারিকা বলল—উনি এসেছেন, মহারানী।

ওনাকে ভেতরে পাঠিয়ে দিয়ে তুমি বাইরে প্রহরায় থাকো।

বেরিয়ে গেল পরিচারিকা। কুন্তীর চোখ দুয়ারের দিকে। দুয়ার ঠেলে প্রবেশ করলেন একজন মানুষ, সুদর্শন, উদ্বিগ্ন। মানুষটি বিদুর।

আসন গ্রহণ করতে করতেই প্রশ্ন করলেন বিদুর, কী সংবাদ আর্যে, এত রাত্রে…

স্থিরদৃষ্টিতে দেবরের দিকে তাকালেন কুন্তী, কাল আমরা চলে যাচ্ছি, বিদুর।

চোখ ফিরিয়ে নিলেন বিদুর, জানি আর্যে। আপনি, মধ্যমাগ্রজ এবং আর্যা মাদ্রী।

আমরা চলে যাচ্ছি, বিদুর।

কুন্তীর স্বরে স্বাভাবিকতার বাইরে অন্য কিছু ছিল। চমকে উঠলেন বিদুর, কী বলতে চাইছেন, আর্যে? আপনারা তো কিছুদিনের জন্য বনবিহারে যাচ্ছেন!

বিদুরের কণ্ঠস্বরে সুস্পষ্ট আর্তি, যেন কোন-এক অমূল্য সম্পদ, কোন সত্তাভরানো আলো তাঁর হাত থেকে ছিনিয়ে নিচ্ছে কেউ। বিস্মিতা হলেন না কুন্তী, কারণ এই আর্তির অনুচ্চার উৎসভূমি তাঁর অপরিচিত নয়। বরং, বিদুরের এই আর্তিই প্রত্যাশিত ছিল তাঁর।

কুন্তী বললেন, হ্যাঁ, বনবিহার। কিন্তু আমার মন বলছে বিদুর, চিরদিনের মতো বনবাসে চলেছি আমরা।

এ-কথা আপনি কেন ভাবছেন, আর্যে ?

কুন্তী গম্ভীর, প্রশ্ন কোরো না বিদুর। উত্তর দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

বিদুরের শরীর জুড়ে হিমস্রোত। রাত পোহালেই এই নারী চোখের বাইরে, চিরদিন ? ওই মুখ, ওই দুটি চুম্বক-চোখ, ওই কণ্ঠস্বর—নির্বাসিত হবে কোন বনভূমিতে, বিদুরের সীমানা পেরিয়ে অনেক দূরে ? শান্ত হও, শিরায় শিরায় বহমান হে হিম তরল, শান্ত হও, স্থির হও !

কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে কুন্তী বললেন, কিন্তু, তোমাকে আমি মুক্তি দিয়ে যাব না, বিদুর।

কেঁপে উঠলেন বিদুর। মুক্তি ? কে চায় মুক্তি ? চোখের গভীরে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা জেলে বিদুর নির্বাক।

তোমাকে আমার প্রয়োজন হবে, যে-কোন কাজে, যে-কোন মুহূর্তে। বললেন কুন্তী—তুমি নিশ্চয়ই আমাকে বিমুখ করবে না, বিদুর !

শরীরের সবটুকু শক্তি সংহত করে একটা উগ্‌রে-আসা আর্ত চিৎকার ঠেকালেন বিদুর। ভ্রূ দুটি কাঁপছে, মুখের পেশীতে অবাধ্য স্পন্দন। উঠে দাঁড়ালেন, এগিয়ে গেলেন কয়েক পা। তাঁর চোখের সামনে দীপশিখা। গাঢ় উচ্চারণে নতজানু হল বিদুরের কণ্ঠস্বর—আর্যে, আপনাকে বিমুখ করার সাধ্য এই পারসব বিদুরের নেই।

গভীর তৃপ্তিতে শ্বাস ফেললেন কুন্তী।

দুই স্ত্রীকে নিয়ে অনির্দিষ্টকালের জন্য বনবিহারে চলে গেলেন মহারাজ পাণ্ডু। বন, পাহাড়, প্রকৃতি। পৃথিবীর চেহারা এখানে আলাদা। অনেক বড়, ছড়ানো, কাজ-ভোলানো। এই অমেয়

নিসর্গের ছোঁয়ায় মুছে যায় যাবতীয় মালিন্য, জমে-থাকা খেদ।

অথচ, ভাবতে অবাক লাগে কুন্তীর, জ্বালা তো মেটে না নিঃশেষে! স্বামীর পাশে ওই নারী, লাস্যময়ী, থরোথরো-যৌবনা —অসহ্য, এখানেও, এই অসীমের অঙ্গনেও।

মাদ্রী। পাণ্ডুর দ্বিতীয়া মহিষী। ভ্রাতুষ্পুত্র পাণ্ডর জন্য মদ্ররাজ শল্যর কাছ থেকে তাঁর ভগ্নী মাদ্রীকে চেয়ে এনেছিলেন গঙ্গাপুত্র ভীষ্ম। কুন্তীর জন্য তাঁর পিতা বরপণ তুলে দিয়েছিলেন পাণ্ডুর হাতে, আর মাদ্রীকে আনার জন্য মদ্ররাজ শল্যের হাতে কন্যাপণ দিয়ে আসতে হয়েছিল ভীষ্মকে—রথ, অশ্ব, গজ, মণি, মুক্তা, প্রবাল, নানান পোশাক-পরিচ্ছদ। বিবাহটাও মদ্ররাজ্যে হয় নি। মাদ্রীকে হস্তিনায় নিয়ে এসে ভ্রাতুষ্পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দিয়েছেন ভীষ্ম। মদ্রদেশের সবই যেন অদ্ভুত, ঠিক বুঝে উঠতে পারেন না কুন্তী। সে দেশে নাকি নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই সুরাপান করে। নারীরা যথেচ্ছাচারী। ধর্মাচরণও নাকি বেদসম্মত নয়। সেই বিচিত্র দেশের মেয়ে মাদ্রী, কুন্তীর সপত্নী। লাবণ্যে, সৌন্দর্যে কুন্তীর সঙ্গে কোন তুলনাই হয় না তার। কিন্তু মদ্রদেশের যুবতীটির শরীর জুড়ে যৌবনের বাঁধনছেঁড়া ঢল, অপ্রতিরোধ আকর্ষণ। অসহায় পাণ্ডু আগুনমুখী পতঙ্গ হয়ে গেছেন। ঝাঁপ দিয়ে হারিয়ে গেছেন অগাধ সাগরে।

কুন্তীর একান্ত জগতে আলো নেই। জ্বালাই সম্বল।

আর, অপ্রাপ্তির গভীর থেকে এক না-ভোলা স্মৃতির জাগরণ: অশ্বনদী, তীব্র স্রোত, ছোট্ট মঞ্জুষা এবং একটি অসহায় মুখ। সে মুখ মনে পড়ে না আর, কিন্তু সমস্ত সত্তা জুড়ে মাথা তোলে শূন্যতা ভরানোর আর্তি: অন্য কোন মুখ, আর-এক শিশু, ধরা দিক কোল জুড়ে! আজ আর বাধা নেই, সমাজের রক্তচোখ নেই। আজ আর কোন অসহায় প্রাণকে ভাসাতে হবে না কালস্রোতে।

কিন্তু, সে তো এল না আজও! সেই ক্ষুদ্র সত্তা, ছোট্ট শরীর, আজও যে অনাগত!

কুন্তী-মাদ্রীকে কুটিরে রেখে গভীর অরণ্যে শিকার করতে চলেছেন পাণ্ডু। কাঁধে ধনুর্বাণ, কোমরে তরবারি। সুদক্ষ ধনুর্বিদ পাণ্ডু।

অজস্র গাছের ঘন ছায়ায় সূর্য উধাও। বনভূমির বুক জুড়ে ঝরাপাতার মখমল-কোমল গালিচেয় নরম ছায়ার অথৈ স্নেহ, ক্বচিৎ কোথাও রোদের মিহি রেখা। এগিয়ে চলেছেন পাণ্ডু। অরণ্যের কঠিন জীবনেও ক্লান্ত নন তিনি। শরীরে তৃপ্তির স্বাদ, মনের প্রান্তরে সুখ। তৃপ্তি আর সুখ আর শেষহীন তৃষ্ণা। অরণ্যচারী পাণ্ডুর চোখ জুড়ে দাঁড়িয়ে আছে এক রমণী: মাদ্রী। সুখের অনন্ত উৎস খুঁজে পেয়েছেন পাণ্ডু। আজও ওই রমণী-তনুর সবটুকু রহস্য নিঃশেষে জানা হয় নি তাঁর।

হঠাৎই থমকে গেলেন শিকারসন্ধানী পাণ্ডু। ও কী? খানিক দূরে, ঝোপের আড়ালে...

মাথার মধ্যে অকস্মাৎ প্রচণ্ড বিস্ফোরণ। দুর্বার ক্রোধে টানটান হয়ে উঠলেন পাণ্ডু।

ঝোপের আড়ালে এক হরিণীর সঙ্গে দৈহিক সঙ্গমে রত একটি মানুষ! পশুমিলন! না, সমাজে পশুমিলন একেবারে অপরিচিত কোন ঘটনা নয়। অতীতে এমন ঘটনা অজস্রই ঘটেছে। অশ্বমেধ যজ্ঞের সময় যজ্ঞের অশ্বটির সঙ্গে রাজমহিষীর দৈহিক মিলন ঘটানোর কথাও অজানা নয় পাণ্ডুর। তবু, চোখের সামনে এই দৃশ্য বড় কুৎসিত।

দ্রুত হাতে ধনুকে তীর জুড়লেন পাণ্ডু। চোখের সাদায় লালের ছটা, চোয়াল টানটান। অব্যর্থ তীরন্দাজের দিগ্বিজয়ী ধনু থেকে বিদ্যুৎবেগে নিক্ষিপ্ত হল মৃত্যুর ঠিকানা লেখা পাঁচটি তীর। ছিঁড়ে গেল বনজ বাতাস, কেঁপে উঠল সবুজ সবুজ গাছের সারি, শিহরিত হল পাখির ঝাঁক। আর্তনাদ করে ছিটকে পড়ল মিলনরত মানুষটি। পৃথিবীর কাছে অন্তিম অভিযোগ জানিয়ে

শেষঘুমে ঢলে পড়ল সুন্দরী হরিণী।

এগিয়ে গেলেন পাণ্ডু। শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ। মাথা তুলল মুমূর্ষু মানুষটি, যন্ত্রণার্ত গলায় ফুটল বিস্ময়ের আভাস, এ কি, মহারাজ পাণ্ডু, আপনি ?

পাণ্ডুর গলা কঠিন, হ্যাঁ, আমি। কিন্তু তুমি কে ?

ক্রোধের অগ্নিকণা ফুটে উঠল মানুষটির চোখে, আমি তপস্বী, নাম কিমিন্দম্।

তপস্বী ? পাণ্ডু বিস্মিত, তপস্বী হয়ে আপনি এই অন্যায় কাজে রত হয়েছিলেন ?

অবিরাম রক্তপাতে দুর্বল তপস্বীর কণ্ঠে শ্লেষ ফুটল, অন্যায় ? মহারাজ, পৃথিবীতে কোন্‌টা ন্যায় আর কোন্‌টা অন্যায়, তা বিচার করার আপনি কে ? প্রতিটি মানুষের ন্যায়-অন্যায় নির্ধারণের মানদণ্ড ভিন্ন ভিন্ন। সঙ্গমকালে কারুকে হত্যা করাটা কোন্ ন্যায়ধর্মের লক্ষণ ?

পাণ্ডু বিচলিত। পশুমিলনে বিতৃষ্ণা থাকলেও মিলন শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করা যে উচিত ছিল, তা তিনি অনুভব করছেন মনে মনে।

সময় ফুরিয়ে আসছে তপস্বী কিমিন্দমের। মাটির বুকে চাপ চাপ রক্ত—কিমিন্দমের, হরিণীর। বনভূমি মৌন।

অনেক কষ্টে মাথা তুললেন কিমিন্দম, তাঁর ফিসফিস-প্রায় উচ্চারণে ধ্বনিত হল মহাকালের মহাস্বর—আপনি যেমন সুখের সময় আমাকে দুঃখ দিলেন, তেমনি আপনাকেও সুখের সময় দুঃখ পেতে হবে। আমি, তপস্বী কিমিন্দম্, অভিশাপ দিচ্ছি—স্ত্রী-সংসর্গ করার সময়ই মৃত্যু হবে আপনার। আমার এ অন্তিম অভিশাপ কখনও ব্যর্থ হবে না।

থরথর করে কেঁপে উঠলেন দিগ্বিজয়ী নৃপতি, বনভূমি শিহরিত এবং বাতাসের গোপন রন্ধ্রে কোথাও মরণডাক। কিমিন্দমের চোখ থেকে শেষ আলোটুকু মুছে নিল বসুন্ধরা। মহা-

শূন্যের তুলোটে অভিশাপের বর্ণমালা। প্রকৃতির সব রঙ মুছে ফেলে কুটিরে ফেরার পথ খুঁজলেন পাণ্ডু।

স্তব্ধ হয়ে গেলেন কুন্তী। ভবিষ্যৎ মুছে যাচ্ছে ভাবনার পৃষ্ঠা থেকে। ছিদ্রহীন অন্ধকার।

দুই স্ত্রীকে উদ্দেশ্য করে পাণ্ডু বললেন, আমি রাজ্যাশ্রম ত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করব। তোমরা হস্তিনাপুরে ফিরে যাও।

ক্লান্ত চোখ দুটি তুললেন কুন্তী, না আর্যপুত্র, তা হয় না। আপনার পথ আর আমাদের পথ ভিন্ন হতে পারে না।

কিন্তু কুন্তী, ভেবে দ্যাখো, বনবাসের জীবন বড় কঠিন। তাছাড়া, আমি এখন তোমাদের তৃপ্তি দিতেও অক্ষম···

কথা বললেন মাদ্রী, কিসের অক্ষমতা, মহারাজ? কেউ অভিশাপ দিলেই আপনি শারীরিকভাবে অক্ষম হয়ে পড়বেন, এ-কথা মনে করার কোন সঙ্গত কারণ আছে বলে আমার মনে হয় না।

পাণ্ডু শিহরিত, এ কী বলছ, মাদ্রী? তপস্বী ব্রাহ্মণের অভিশাপ কখনও ব্যর্থ হয়?

মদ্রদুহিতা মাদ্রীর মনে ব্রাহ্মণভীতি এতটা তীব্র নয়। মদ্রদেশের ধর্মাচরণ, সামাজিক রীতিনীতি অন্য ধরনের। ফলে ব্রাহ্মণ্য প্রভাব থেকে তিনি অনেকটাই মুক্ত। পাণ্ডুর কথা শুনে হালকা ব্যঙ্গের আভাস ফুটল তাঁর চোখের কোণে। বললেন, ব্রাহ্মণ-অব্রাহ্মণে কিছু যায়-আসে না, মহারাজ। আপনি শক্ত থাকুন, মনকে দৃঢ় করুন। এক নিরীহ তপস্বীকে বধ করে আপনি অবশ্যই অন্যায় করেছেন, কিন্তু তাঁর অভিশাপে আপনি মিলনাক্ষম হয়ে যাবেন বলে আমি মনে করি না।

দু'হাতে কান চাপা দিলেন পাণ্ডু। এমন কথা শোনাও যে পাপ! ব্রাহ্মণের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে, তাঁদের ঈশ্বরদত্ত ক্ষমতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছেন মাদ্রী। চিৎকার করে উঠলেন পাণ্ডু, স্তব্ধ হও মাদ্রী, স্তব্ধ হও! এমন কথা আর কখনও উচ্চারণ কোরো না।

এতদিনের অভ্যস্ত সংস্কারে আঘাত পড়েছে কুন্তীরও। তবু, তার মধ্যেও, মাদ্রীর কথায় কী-যেন-এক আশার আলো। কুন্তী বললেন, আর্যপুত্র, সন্ন্যাসাশ্রম ব্যতীত এমন অনেক আশ্রম আছে, যেখানে সস্ত্রীক ধর্মাচরণ করা যায়। আপনি সে-রকম কোন আশ্রমই অবলম্বন করুন।

কোন প্রতিবাদী উচ্চারণে মুখর হতে যাচ্ছিলেন মাদ্রী, স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেলেন। হতভাগ্য মানুষটির চোখে-মুখে মৃত্যুর নিশ্চিত আস্তরণ।

ধীর, বিষণ্নকণ্ঠে পাণ্ডু বললেন, যদি আমার সঙ্গেই থাকতে চাও তোমরা, তাহলে এখন থেকে বল্কল ধারণ করতে হবে, ফলমূলই হবে একমাত্র আহার, সংযত করতে হবে ইন্দ্রিয়কে। আমি এই অরণ্যেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করব।

মাদ্রী সম্মতা। ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে সম্মতি জানালেন কুন্তীও। তাঁর চোখের সামনে একটা ঝাপসা ছবি দুলছে।

৪

হস্তিনাপুর থেকে সংবাদ এসেছে—রাজপদে অধিষ্ঠিত হয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র। পাণ্ডু বিষণ্ণ হেসেছেন। মাদ্রী বিচলিতা। আর কুন্তী...

স্বামী প্রব্রজ্যা নেওয়ার পর হস্তিনাপুরের সিংহাসন যে শূন্য থাকবে না, এ তো কুন্তী জানতেনই। সে সংবাদে তিনি বিচলিতা নন আদৌ। কিন্তু সেইসঙ্গেই আরেকটি সংবাদ এসে পৌঁছেছে অরণ্যচর মানুষগুলির কাছেঃ ধৃতরাষ্ট্রজায়া গান্ধারী সন্তান-সম্ভবা।

এই সংবাদ ব্যাকুল করেছে কুন্তীকে। তিনি বুদ্ধিমতী। ভবিষ্যতের ছবিটা দেখতে পান অনেক দূর পর্যন্ত। গান্ধারী পুত্রসন্তান প্রসব করলে রাজপুত্র এবং বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে সে-ই যে অধিকারী হবে রাজপদের, তাতে কোন সন্দেহই নেই।

আর ঠিক এই জায়গাটাতেই কুন্তীর জ্বালা। স্বামী রাজপদ হারিয়েছেন, বা বলা ভাল ত্যাগ করেছেন—তাতে কিছু যায়-আসে না। রাণী হওয়ার মোহ কুন্তীর নেই। কিন্তু তাঁর সন্তানরা… তাঁর সন্তানরা বনচরের জীবন কাটাবে, কথাটা ভাবতেও তীব্র যন্ত্রণায় আচ্ছন্ন হন কুন্তী। না, তা হয় না, হতে পারে না।

কিন্তু, কোথায় সেই সন্তান? কুন্তী আগেই বুঝেছিলেন, স্বামী মিলনাক্ষম না হলেও সন্তানের বীজ বপন করার শক্তি তাঁর নেই। আর এখন, তপস্বী কিমিন্দমের অন্তিম অভিশাপের পর, এক তীব্র মিলনভীতি গ্রাস করেছে তাঁকে। মিলনস্পৃহা হয়ত মুছে যায় নি, হয়ত এখনও দুই যুবতী স্ত্রী তাঁকে আকর্ষণ করে চুম্বকের মতো, কিন্তু কঠোর প্রয়াসে নিজেকে সংযত রাখেন পাণ্ডু। শয়ন করেন একা। মিলন আর মৃত্যু এখন সমার্থক হয়ে গেছে তাঁর চেতনায়। তাহলে? সন্তানের ঠিকানা কোথায় খুঁজে পাবেন কুন্তী? অথচ, সন্তান যে তাঁর চাই-ই। ইদানীং, হয়ত অরণ্যের সীমাহীন মৌনতা অথবা একাকিত্বের কারণেই, তাঁর বুকের গভীরে অনুক্ষণ দোলা দিয়ে যায় সেই অসহায় মুখ, কালস্রোতে ভেসে যাওয়া তাঁর রক্তেমাংসে গড়া সেই প্রথম মানবশিশু। অস্থির হয়ে ওঠেন কুন্তী। আর সেই অস্থিরতার সমুদ্র মন্থন করে উঠে আসে এক পুরনো স্মৃতি। পরম মমতায় কুন্তী হাতে তুলে নেন একটি বিশেষ কুণ্ডল: জীবনের প্রথম পুরুষ দুর্বাসা-প্রদত্ত সেই অমোঘ অভিজ্ঞান। ঝাপসা ছবিটা ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর চোখের সামনে। সেইসব মোহন পুরুষ…

কিন্তু, এ অভিজ্ঞান যে পেঁছে দিতে হবে কোন নারদের হাতে! কে দেবে পেঁছে? চরম বিশ্বাসীজন ছাড়া এ দায়িত্ব তো অন্য কারুর হাতে তুলে দেওয়া যায় না। শতশৃঙ্গ পর্বতের বনস্থলীর গহন ছায়ায় গভীর ভাবনায় ডুবেছেন কুন্তী। ভাবতে গিয়ে শতশৃঙ্গের শিখরে, অগুনতি মহীরুহের পাতায় পাতায় ফুটে উঠেছে একটিই মুখ, একটিই নিলাভ ছায়া: বিদুর। মনে পড়েছে

সেই শেষ রাতের একান্ত উচ্চারণ, আর্তিভরা কাতর চোখ, সেই ধ্রুব প্রতিশ্রুতি। হ্যাঁ, কুন্তীর জীবনে এখন এই একমাত্র মানুষ, যার হাতে নিশ্চিন্তে তুলে দেওয়া যায় ঐ অভিজ্ঞান।

বনবাসী এক বিপ্রকে নির্জনে ডাকলেন কুন্তী। বিপ্রটি মাঝ-বয়সী। বল্কলপরিহিতা কুন্তীকে অভিবাদন জানালেন বিপ্র। কুন্তী বললেন, হে মুনিবর, আপনার কাছে আমার একটি নিবেদন আছে।

বলুন মহারাণী।

হাসলেন কুন্তী, আমি আর মহারাণী নই, মুনিবর। আমাকে আর ঐ সম্বোধনে সম্বোধিত করবেন না। যাক। শুনুন, একটি বিশেষ কাজে আপনাকে আমি একবার হস্তিনানগরে পাঠাতে চাই। যেতে-আসতে আপনার হয়ত একটি মাস সময় লাগবে। বলুন মুনিবর, যাওয়া কি সম্ভব আপনার পক্ষে?

কবে যেতে হবে, আজ্ঞা করুন।

কুন্তীর চোখের মণিতে মেঘছেঁড়া রোদ, সম্ভব হলে আজই, এখনই।

আপনার আজ্ঞা প্রতিপালিত হবে। বলুন, কোন্ কর্তব্য পালন করতে হবে আমায়।

ঈষৎ রাঙা আভা খেলে গেল কুন্তীর মুখমণ্ডলে। মুখ নামিয়ে বললেন, হস্তিনায় গিয়ে আপনাকে সাক্ষাত করতে হবে মহামন্ত্রী বিদুরের সঙ্গে। গোপনে। সাক্ষাৎ করে তাঁকে বলবেন…বলবেন, আমি ডেকেছি। তিনি যেন সংবাদ পাওয়া মাত্রই চলে আসেন।

আর কিছু?

একটু ভাবলেন কুন্তী। তারপর বললেন, না, আর কিছু নয়।

অভিবাদন জানিয়ে বিপ্র বললেন, আমি এখনই যাত্রা করছি।

বনপথে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বিপ্র। কুটিরের দিকে ফিরলেন কুন্তী। তাঁর মাথায় এখন অজস্র চিন্তার জট। তার মধ্যে প্রধান—স্বামীকে রাজি করানো।

বলা যায়, তবু কোথায় যেন কাঁটা, কি-এক সংকোচ। এই শরীরে অধিকার ছিল একমাত্র যে পুরুষের, তার কাছে অন্য, অপরিচিত কোন পুরুষকে শয়নসঙ্গী করার প্রসঙ্গ উত্থাপন করা বড় কঠিন।

কয়েকটা দিন কেটে গেল দ্বিধায়, দোদুল্যমানতায়। অবশেষে সেদিন অপরাহ্নে, পাণ্ডু যখন একটি বিশাল অশ্বত্থগাছের নীচে বসে ছিলেন একা, কাছে গিয়ে বসলেন কুন্তী।

একটু চমকে উঠলেন পাণ্ডু। এই নির্জনে, পড়ন্ত বেলায়, আকাশে যখন ঘোর, অরণ্যে ঝিম্‌ঝিম নেশা—তখন সামনে এক প্রদীপ্ত অগ্নিশীখা! বল্কলে পবিত্রতা থাকলেও তা যে আরও অনাবৃতা করে নারীকে। প্রাণপণে ধমনীর উত্তাল রক্তস্রোত প্রশমিত করার চেষ্টা করতে করতে পাণ্ডু বললেন, কিছু বলবে, কুন্তী?

কুন্তীর সহজ হওয়ার চেষ্টা, আর্যপুত্র, আমার একটি নিবেদন আছে।

বলো।

কুরুবংশে সন্তান আসছে, শুনেছেন তো, আর্যপুত্র?

শুনেছি কুন্তী। আর্যা গান্ধারী সন্তানসম্ভবা হয়েছেন।

এইবার, এই সেই চরম মুহূর্ত, যখন কুন্তীকে উচ্চারণ করতে হবে সেই নির্মম অথচ অবশ্যম্ভাবী কথাটি। বলতেই হবে, কারণ ভবিষ্যতের ছবিটা আঁকতে শুরু করেছেন কুন্তী। বলতেই হবে, কেননা অনেক দূরের কোন্‌-এক অশ্বনদীর জলে এখন তীব্র স্রোত অথবা কূল-ভাসানো প্লাবন, ভয়ংকর, দুর্বার, ভেসে যায় হিমগন্ধা প্রকৃতি আর অসহায় অশ্রুপাত আর তার গর্ভচেরা ফসলের নিহত শবদেহ। তাকে ফিরে পাওয়া চাই।

সরাসরি স্বামীর চোখে চোখ রাখলেন কুন্তী, এবার আমাদেরও তো সন্তান চাই, আর্যপুত্র।

থরথর করে কেঁপে উঠলেন পাণ্ডু। ধমনীর উষ্ণস্রোত উষ্ণতর।

বহুদিনের বুভুক্ষু শরীরে অবাধ্য অশ্বক্ষুরধ্বনি। নিজের অজ্ঞাতেই কিছুটা ঝুঁকে পড়েন পাণ্ডু। কিন্তু পরক্ষণেই সরে আসেন ছিটকে, বিদ্যুৎস্পৃষ্টের মতো, রক্তশূন্য। সন্তান, অর্থাৎ মিলন, এবং মিলনের তালে তাল মিলিয়ে বলিদানের বাদ্যি বাজায় সেই মুমূর্ষু, প্রতিরোধচঞ্চল, ভয়ঙ্কর কণ্ঠস্বর ঃ মৃত্যু, মৃত্যু···

না কুন্তী, না—আর্তনাদ করে ওঠেন পাণ্ডু—সন্তান আসতে পারে না আমাদের! তপস্বী কিমিন্দমের অভিশাপের কথা কি বিস্মৃত হয়েছ তুমি?

না আর্যপুত্র, বিস্মৃত হই নি। স্বাভাবিক উপায়ে আমাদের সন্তান আসা যে অসম্ভব, তা আমি জানি। সেক্ষেত্রে অন্য কোন পন্থা···

থেমে যান কুন্তী। কোন নারীর পক্ষে এর থেকে বেশি করে নিজেকে উন্মোচিত করা সম্ভব নয়। একটু থমকে যান পাণ্ডু। অন্য কোন পন্থা? সন্তান আসার জন্য কোন···চকিতে পাণ্ডুর চেতনায় ঝলক দিয়ে যায় তাঁর নিজের জন্মরহস্য। হ্যাঁ, পন্থা একটা আছেই। যদিও ভাবতে কষ্ট, আপন সম্পদ অন্যের হাতে সঁপে দেওয়ার হাহাকার, তবুও, এ বিধান শাস্ত্রসম্মত।

দূরে কোন পাখির ডাক। দূরমনা পাণ্ডু ধীরকণ্ঠে উচ্চারণ করেন, আছে কুন্তী, অন্য পন্থা আছে। আমার ক্ষেত্রে তুমি জন্ম দিতে পারো ক্ষেত্রজ সন্তানের। অন্য কোন পুরুষের সংসর্গে সন্তানবতী হতে পারো তুমি। শাস্ত্রে দ্বাদশ প্রকার পুত্রের বিধান আছে। আমার ক্ষেত্রে তুমি পুত্রবতী হলে আমারও ঋণ শোধ হয়।

ঋণ? কী ঋণ, আর্যপুত্র?

জন্মানোর সময় থেকেই মানুষ চার ধরনের ঋণে আবদ্ধ হয়, কুন্তী। দেবঋণ, ঋষিঋণ, মনুজঋণ আর পিতৃঋণ। দেবঋণ থেকে মুক্ত হওয়া যায় যজ্ঞ করে, ঋষিঋণ পরিশোধ হয় বেদপাঠ আর তপস্যার সাহায্যে, অনৃশংস আচরণ মানুষকে মুক্ত করে মনুজঋণ থেকে। এই তিন ঋণ থেকে মুক্তি পেয়েছি আমি। কিন্তু

আজও পরিশোধ করা হয় নি আমার পিতৃঋণ। শ্রাদ্ধতর্পণ আর পুত্রোৎপাদন—এই হল পিতৃঋণ পরিশোধের একমাত্র উপায়। পুত্রের অভাবে আজও আমি ঋণী রয়ে গেছি।

একটু চুপ করেন পাণ্ডু। হয়ত গভীরে কোন রিক্ততা অথবা বিস্ফোরণের প্রতিধ্বনি। তারপর দুর্বল স্বরে উচ্চারণ করেন, আমার কোন আপত্তি নেই। ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্ম দাও তুমি।

বনভূমিতে গড়িয়ে আসছে আঁধারের ঢল। সেই আলো-আঁধারী পটভূমিতে কুন্তীর গলায় ফোটে প্রায় অস্ফুট স্বর, আমি বিদুরকে সংবাদ পাঠিয়েছি, আর্যপুত্র।

পাণ্ডু বিমূঢ়। বিদুর? বিদুর কেন? এ সমস্যায় কী ভূমিকা থাকতে পারে সেই বৈমাত্রেয় ভ্রাতাটির? ভাবতে গিয়ে হঠাৎ চমকে ওঠেন পাণ্ডু, একটা অস্পষ্ট ইঙ্গিত চকিতে খেলে যায় ভাবনার জমিতে। হ্যাঁ, বিদুর কুন্তীর দেবর। এবং বিশেষ প্রয়োজনে দেবরের সঙ্গে সহবাসে সন্তানবতী হতে পারে কোন নারী—এ রীতি অশাস্ত্রীয় নয়। যদিও বিদুর এখন বিবাহিত, নৃপতি দেবকের একটি পারসবী কন্যার সঙ্গে বিবাহ হয়েছে তার, তবুও, এ মিলনে বাধা নেই কোন।

গলা কাঁপে পাণ্ডুর, হ্যাঁ, এ পথ অবশ্য শাস্ত্রসম্মত। ক্ষেত্রজ পুত্রের জন্য দেবরের সাহায্য নেওয়ার ঘটনা একাধিক ঘটেছে। তা-ই হোক। আমার কোন আপত্তি নেই, কুন্তী। বিদুরের সহযোগে তুমি সন্তানবতী হতে পারো।

সত্তার মর্মমূল পর্যন্ত কেঁপে উঠল কুন্তীর। বিদুরের সহ-যোগে সন্তান? না,এ-কথা তো একবারের জন্যও ভাবেন নি তিনি। না! বিদুর…সে যে অনেক নিথৈ-গভীরে নীল আলো জ্বালা একটি নাম, ধূসর উপত্যকায় অথবা উষর মরুভূমির মাঝে নিষ্কম্প জেগে থাকা এক ঘন সবুজ মহীরূহ, যার কাছে চাওয়া যায় আঁধার ভাঙা রশ্মি অথবা ক্লান্ত, রোদপোড়া অস্তিত্ব স্নিগ্ধ করার মায়াতী ছায়া। বিদুরকে রাখা যায় চোখের মণির কালচে-নীলে শরীরে

ডাকা যায় না। ভাবা যায় স্বপ্নের সহচর, শয্যার দোসর নয়।

আর্তনাদ করে উঠলেন কুন্তী, না আর্যপুত্র, না! বিদুরকে আমি সে-জন্য সংবাদ পাঠাই নি।

তাহলে? বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলাচলে পাণ্ডু অস্থির, তাহলে কিসের জন্য সংবাদ পাঠিয়েছ তাকে?

চারপাশে পাতা ঝরছে টুপটাপ, যেন একান্ত নিজস্ব কোন ভাষায় গুঞ্জন করছে বিস্তৃত বনভূমি। সেই টুপটাপ গুঞ্জনের মধ্যে বসে কুন্তীর কণ্ঠে ফুটে উঠল এতদিনের না-বলা কথা, মার্জনা করবেন আর্যপুত্র, এ-কথা এতদিন গোপন রেখেছিলাম আপনার কাছে। কুমারী অবস্থায় পিতৃগৃহে থাকাকালীন আমার পরিচর্যায় তৃপ্ত হয়ে মহর্ষি দুর্বাসা আমাকে জানিয়ে গিয়েছিলেন প্রয়োজনে যে-কোন দেবতাকে আহ্বান জানানোর এক গোপন উপায়। ইচ্ছামতো যে-কোন দেবতাকে আহ্বান জানাতে পারি আমি, তাঁদের সহযোগে সন্তানবতীও হতে পারি। কিন্তু তাঁদের কাছে আমার আহ্বান পেঁৗছে দেওয়ার জন্য প্রথম যাঁদের সংবাদ পাঠানো প্রয়োজন, তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগ তো আমি করে উঠতে পারব না, আর্যপুত্র। ঠিক সেই কারণেই আমি সংবাদ পাঠিয়েছি বিদুরকে। আর্যপুত্র, দেবতাদের সহযোগেই সন্তানবতী হতে চাই আমি। আপনি অনুমতি দিন।

না, এতদিনের গোপন কথার বন্ধ দুয়ার মেলে ধরলেও সবটুকু সত্যের ওপর আলো ফেলতে পারলেন না কুন্তী। বলতে পারলেন না দুর্বাসাকে পরিচর্যার প্রকৃত অর্থ কী, কোন্ নিগূঢ় রহস্য লুকিয়ে আছে সেই মহর্ষির তৃপ্ত হওয়ার গভীরে আর একেবারেই নিরুচ্চার রয়ে গেল জীবনজোড়া যন্ত্রণাটির কথা, যেখানে কোন কল্লোলিনীর স্রোতধারায় ভেসে যায়, ভেসে যায় এক দুর্ভাগা প্রাণ, নিষ্পাপ, অসহায়।

সম্মতি দেওয়া ছাড়া, আর কি-ই বা করার ছিল অক্ষম পাণ্ডুর!

শতশৃঙ্গ পর্বতের নিঃসঙ্গ শিখরে, বনস্থলীর নিবিড় নির্জনতায় আঁধার ঘনালো। বসুন্ধরার কোন না-জানা দিগন্তে মুছে গেল আলোর অন্তিম স্বাক্ষরটুকু। এক বিষণ্ণ সূর্যডুবির প্রত্যক্ষদর্শী হল জল-মাটি-বনভূমি! উঠে দাঁড়ালেন পাণ্ডু, বিধ্বস্ত, পরাজিত। এগিয়ে চললেন কুটিরের দিকে। হয়ত তখন কোথাও কোন রাত-চরা পাখি ডেকে উঠেছিল সমবেদনায়, কোন নিশাচর শ্বাপদ হয়ত থমকে দাঁড়িয়েছিল শূন্যতার প্রতিমূর্তি দেখে।

স্বামীর পিছু পিছু এগোলেন কুন্তী। তাঁর সামনে এক টলোমলো অস্তিত্বহীনতার শ্লথ চলন। ব্যথা, বুকের কোটরে তাই ব্যথা কুন্তীর। আর, সেই ব্যথা ছাপিয়ে, এক সযত্নলালিত প্রত্যাশার জাগরণ, প্রত্যাশাপূরণের উচ্চকিত ঘোষণা।

দিন কাটল, মাস গড়াল। বিদুর এলেন দুর্বাসাপ্রদত্ত অভি-জ্ঞানটি নিয়ে চলে গেলেন যথাস্থানে পৌঁছে দিতে। অধীর প্রতী-ক্ষায় উন্মুখ হয়ে রইলেন কুন্তী। অবশেষে একদিন কুটিরের সামনে এসে দাঁড়ালেন এক উজ্জ্বলবর্ণ পুরুষ, সৌম্যদর্শন, চোখে-মুখে প্রজ্ঞার ছাপ। তিনি বললেন, আমি দেবলোক থেকে আসছি। আমার নাম ধর্ম।

মুখ তুললেন পাণ্ডু। হ্যাঁ, কুন্তীর গর্ভে সন্তান উৎপাদনের জন্য এই মানুষটিকেই আহ্বান জানানো হয়েছে। সম্মতি দিয়েছেন অসহায় পাণ্ডু। দেবগোষ্ঠী যে অনেক উন্নত,অনেক অগ্রসর—তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু, যতই উন্নত, যতই অগ্রসর হোক, তবু তারা ভিন্ন গোষ্ঠী। কুরুবংশের ক্ষেত্রজ সন্তান জন্ম নেবে ভিন্ন গোষ্ঠীর কোন পুরুষের ঔরসে? মন থেকে জানতে পারেন নি পাণ্ডু। কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাসের ঔরসে পৃথিবীতে এসেছিলেন অগ্রজ ধৃতরাষ্ট্র এবং তিনি নিজে। কিন্তু কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস ছিলেন পিতামহী সত্যবতীর সন্তান। সম্পর্ক একটা ছিলই তাঁর সঙ্গে এ বংশের। না, দেবগোষ্ঠীর কাউকে আহ্বান জানাতে আন্তরিক সম্মতি ছিল না পাণ্ডুর। বরং বিদুর…সে যদি হত…

মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু সেখানে কুন্তীর তীব্র আপত্তি আর পাশাপাশি কোন দেবতার সহযোগে সন্তানবতী হওয়ার দুর্মর আকাঙ্ক্ষা…এড়াতে পারেন নি পাণ্ডু, মেনে নিয়েছেন। মেনে নিয়ে শুধু বলেছিলেন, তা-ই যদি হয়, তাহলে আহ্বান করো ধর্মকে। দেবগোষ্ঠীর মধ্যে ঐ মানুষটিই গুনের বিচারে শ্রেষ্ঠ বলে শুনেছি।

সেই ধর্ম স্বয়ং এসে দাঁড়িয়েছেন কুটিরের দুয়ারে। উঠে দাঁড়িয়ে স্বাগত জানালেন পাণ্ডু, আসুন মহাত্মন্। আসন গ্রহণ করুন।

কুশের আসনে উপবেশন করলেন ধর্ম। আর ঠিক তখনই দ্বারপ্রান্তে দেখা গেল এক বল্কলপরিহিতা নারীকে। কুন্তী এসেছেন।

৫

সূর্যদেব যে কতবার পূব আকাশে মুখ ভাসিয়ে হারিয়ে গেলেন পশ্চিম দিগন্তে, ইয়ত্তা নেই। কত অগণন চাঁদভাসা অথবা চাঁদখসা রাত যে ফুরিয়ে গেল মহাকালের অফুরান ভাণ্ডার থেকে, কে তার হিসেব রাখে! তবু কোথাও একটা বৃত্ত কাজ করে চলে নিরন্তর, অক্লান্ত। বারবার মানুষকে ফিরে ফিরে আসতে হয় ঐ শাশ্বত বৃত্তের কোন একটি বিন্দুতে, যেখানে সে দেখে পুরনো দর্পনে নতুন মুখ। সেই বিশেষ বিন্দুটিতে সেদিন এসে দাঁড়াতে হল পাণ্ডুকেও।

মাদ্রী বললেন, আপনি কি আমার কথা একেবারেই বিস্মৃত হয়েছেন, আর্যপুত্র?

পাণ্ডু বিস্মিত, এ কী বলছ মাদ্রী? তোমাকে আমি বিস্মৃত হয়েছি?

হয়েছেন আর্যপুত্র, একেবারেই বিস্মৃত হয়েছেন—মাদ্রীর কণ্ঠস্বরে অভিমানের উত্তাপ—বিস্মৃত না হলে এতটা অবিচার কি আপনি করতে পারতেন আমার ওপর!

অবিচার ? থৈ খ‍ুঁজে পান না প্রাক্তন নরপতি—কী অবিচার আমি তোমার ওপর করেছি, মাদ্রী ? বলো, যদি আমার সাধ্যের মধ্যে হয়, তাহলে অবশ্যই তার প্রতিবিধান করার চেষ্টা করব।

মহারাজ, ঋষিশাপে আপনি সন্তান উৎপাদনে বঞ্চিত হয়েছেন, তাতে আমার কোন খেদ নেই। এই বনচর জীবনের জন্যেও কোন অনুতাপ নেই আমার মনে। আর্যা গান্ধারী যে পুত্রসন্তানের জন্ম দিয়েছেন, তা শুনেও আমি কোন দুঃখ অনুভব করিনি। কিন্তু…

থমকে গেলেন মাদ্রী। কোন এক কঠিন কথা উচ্চারণে হয়ত দ্বিধার দল রুদ্ধ করছে তাঁর কণ্ঠস্বর। পাণ্ডুর গলায় আগ্রহ ফুটল কিন্তু কী মাদ্রী ? কোন্ ঘটনা ব্যথিত করছে তোমাকে ? বলো মাদ্রী, নির্ভয়ে বলো।

মনের মধ্যে যেন শক্তি সঞ্চয় করার চেষ্টা করলেন মাদ্রী। নিজেকে সংযত করে নিয়ে বললেন, আর্যপুত্র, আমি এবং কুন্তী উভয়েই আপনার ভার্যা। আমরা দুজনই আপনার কাছে সমান। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য আমার, কুন্তী পুত্রবতী হলেন আর আমি সে সুখে বঞ্চিতই রয়ে গেলাম। বলুন মহারাজ, এ কি অবিচার নয় ?

পাণ্ডুর সমস্ত চেতনা মথিত করে বেরিয়ে এল একটি দীর্ঘশ্বাস মাদ্রী, তুমিও ! অসহায় মানুষটির সেই দীর্ঘশ্বাসে নিষ্ফলা বৃক্ষের হাহাকার ছিল।

মাদ্রী উতলা, আর্যপুত্র, নারীমাত্রেই চায় সন্তানের জননী হতে। কিন্তু আপনি অক্ষম হওয়ার পর থেকে সে আশা আমি পরিত্যাগই করেছিলাম। মনের মধ্যে একটা শূন্যতা অনুভব করলেও কোন খেদ ছিল না আমার। জানতাম, স্বামী যখন নিরুপায়, তখন এই ভবিতব্যকেই মেনে নিতে হবে নির্দ্বিধায়। কিন্তু যখন দেখলাম আমার সপত্নী কুন্তী সেই ভবিতব্যকে অস্বীকার করে সার্থক করে তুলছেন নিজের স্বপ্ন, তখন আর আমি নিজেকে কোন প্রবোধ দিতে পারি নি, আর্যপুত্র। একই স্বপ্ন জেগে উঠেছে

আমার মধ্যেও, বারবার তাকিয়েছি আপনার দিকে। অথচ আপনি নির্লিপ্ত, উদাসীন। হতভাগিনী আমি বঞ্চিতই থেকে গেছি।

নিজেকে সংযত করার চেষ্টা করলেন পাণ্ডু। কথাটা মাদ্রী কিছু ভুল বলেন নি। সত্যিই তো, স্বামীর অক্ষমতার বাঁধন ছিঁড়ে পুত্রবতী হয়েছেন কুন্তী। একটি নয়, তিন তিনটি পুত্র সন্তানের গর্বিতা জননী এখন তিনিঃ যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, অর্জুন। ধর্মের ঔরসে প্রথম সন্তান যুধিষ্ঠিরের জন্ম দেওয়ার পর কুন্তী আহ্বান করেছিলেন বায়ুকে। এসেছিলেন বায়ু। তাঁর সঙ্গে মিলিতা হয়েছিলেন পাণ্ডুজায়া কুন্তী। সেই মিলনের সন্তান তাঁর মধ্যম পুত্র ভীমসেন। হৃষ্টপুষ্ট, সবল সন্তান। অতঃপর কুন্তীর আহ্বানে সাড়া দিয়ে শতশৃঙ্গ পর্বতে পা রেখেছিলেন দেবগোষ্ঠীর অধিপতি ইন্দ্র স্বয়ং। রূপলাবণ্য, যৌবন, রমনীমোহন মাদকতায় ইন্দ্র অতুলনীয়। মোহিত হয়েছিলেন কুন্তী। সন্তানদাতা তিনটি পুরুষের মধ্যে ইন্দ্রই যে হতে পেরেছিলেন তাঁর প্রিয়তম, সবথেকে আকাঙ্ক্ষিত—সেটা গোপন থাকে নি। ওদিকে হস্তিনাপুর থেকে সংবাদ এসেছে—একাধিক সন্তানের জননী হয়েছেন ধৃতরাষ্টজায়া গান্ধারী। হস্তিনাপুর থেকে সে সংবাদ এলেও নিজের ক্ষেত্রজ পুত্রদের কারুরই জন্মসংবাদ হস্তিনাপুরে পাঠান নি পাণ্ডু। কেন পাঠান নি, তা ব্যাখ্যা করা দুরূহ। মানুষের মন নামক সেই অতিবিচিত্র বস্তুটির গতিপ্রকৃতি নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তার অজস্র কোটরে কখন যে কোন্ চোরাস্রোত বয়ে চলে, কেন বয়ে চলে, কোথায় সেইসব স্রোতধারার উৎস, কে জানে। নিজের মানসিক গতিবিধি নিজেই যেন বুঝে উঠতে পারেন না পাণ্ডু। সন্তানজন্মের সংবাদ কেন পাঠানো হল না হস্তিনায়? তাহলে কি ভিন্ন গোষ্ঠীর পুরুষদের ঔরসে জাত এই পুত্রদের আমি মেনে নিতে পারছি না নিজের সন্তান বলে? নাকি সেইসব পুরুষদের প্রতি ঈর্ষা? অথবা আমার অক্ষমতার জ্বালাই প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াচ্ছে আমার সামনে? বুঝে উঠতে পারেন না পাণ্ডু। কুন্তীকে

দেখেন, সন্তানদের দেখেন। কুন্তী এখন জননী। আর আজ, একই আর্তি নিয়ে সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর দ্বিতীয়া স্ত্রী মাদ্রী না, ভুল বলেন নি মাদ্রী। কুন্তী যদি পুত্রবতী হতে পারেন নিষ্ঠুর ভবিতব্যকে অস্বীকার করে, তাহলে মাদ্রীই বা পারবেন না কেন ?

সামান্য হাসলেন পাণ্ডু, আমি তোমাকে অনুমতি দিচ্ছি মাদ্রী। নিজের ইচ্ছামতো যে-কোন পুরুষকে আহ্বান করে সন্তানবতী হও তুমি।

কিন্তু মাদ্রীর মনের গহনে প্রত্যাশার চেহারাটা একটু অন্যরকম ছিল। যে-কোন পুরুষ ? যে-কোন পুরুষের সহযোগে সন্তান-বতী হওয়া ? না, তাতে রুচি নেই মাদ্রীর। তিনি দেখেছেন ধর্মকে, বায়ুকে, ইন্দ্রকে। তাঁদের মোহন রূপে বুকের গভীরে ঢেউ জেগেছে মাদ্রীর। তাছাড়া, সপত্নী কুন্তীর সন্তানরা দেবপুত্র তাঁর সন্তানরা তাঁদের থেকে হীন হোক, তা চান না মাদ্রী। কাজেই···

মাদ্রী বললেন, আর্যপুত্র, আমিও ··আমিও কোন দেবতার সন্তান গর্ভে ধারণ করতে চাই।

বিস্মিত হওয়ার শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলছেন পাণ্ডু। শুধু একটু বিভ্রান্তি ফুটল তাঁর চোখেমুখে, তাহলে কুন্তীকে বলছ না কেন ? তাকে বললে সে অবশ্যই তোমার জন্য কোন-না-কোন দেবতাকে সংবাদ পাঠাবে।

একটু যেন লজ্জার আভা দেখা দিল মাদ্রীর মুখমণ্ডলে। মাটির দিকে চোখ নামিয়ে বললেন, না মহারাজ, তা আমি পারব না। কুন্তী আমার সপত্নী। তাঁর কাছে নিজের মুখে এ অনুরোধ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। তাছাড়া আমি অনুরোধ করলে তিনি তা রক্ষা করবেন কিনা, তাতেও সন্দেহ আছে। তবে···

তবে ? পাণ্ডু জিজ্ঞাসু।

এবার চোখ তুললেন মাদ্রী, তবে আপনি স্বয়ং যদি আমার

হয়ে তাঁর কাছে অনুরোধ জানান, তাহলে তিনি কোনমতেই অস্বীকার করতে পারবেন না। আমার এ প্রার্থনাটুকু রক্ষা করুন, আর্যপুত্র।

মাদ্রীর চোখেমুখে কাতর মিনতি আর আকুল প্রত্যাশা। উঠে দাঁড়ালেন পাণ্ডু, ধীর গলায় বললেন, নিশ্চিন্ত থাকো, মাদ্রী। তোমার অনুরোধ আমি পৌঁছে দেব কুন্তীর আছে।

স্বপ্ন সফল হল মাদ্রীর। তিনি জানতেন, স্বামীর একান্ত অনুরোধে একবার সম্মতা হলেও দ্বিতীয়বার তাঁকে এ সুযোগ দেবেন না কুন্তী। তাই একসঙ্গে দুই অশ্বিনীকুমারকে নিজের শরীরে ডেকেছিলেন মাদ্রী। স্বপ্ন সফল হয়েছে তাঁর। যমজ পুত্র-সন্তানের জননী হয়েছেন তিনি। যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুনের পর আরও দুটি ক্ষেত্রজ পুত্রের পিতা এখন পাণ্ডু: নকুল আর সহদেব শতশৃঙ্গবাসী মুনি আর মুনিপত্নীদের স্নেহচ্ছায়ায় বড় হয়ে উঠছে পাঁচটি মানবসন্তান।

সুখ। সুখ আর শান্তি। কিন্তু এই সুখশান্তির গহীন পারাবারেও কোথায় যেন চড়া পড়ে, কোথায় যেন মাথা তোলে এক নির্জলা ডাঙা। একটা অপূর্ণতা বুক কোরে মাদ্রীর। স্বামী উদাসীন, নির্লিপ্ত। যেন পৃথিবীর যাবতীয় দায়িত্ব পালন করে নতুনতর কোন জীবনের অপেক্ষায় প্রতীক্ষারত। ওদিকে চোখের সামনে খেলে বেড়ায় সপত্নী কুন্তীর তিন তিনটি পুত্র। খেলে বেড়ায় তাঁর পুত্ররাও। কিন্তু সংখ্যার হিসেবে স্পষ্ট গরমিল। কুন্তীর তিনটি পুত্র, তাঁর দুটি। অন্তত আর একটি পুত্র যে চাই-ই মাদ্রীর এবং তাকেও হতে হবে দেবপুত্র।

অতএব আবার স্বামীর কাছে আবেদন জানালেন মাদ্রী। এবং আবার নির্জনে পাণ্ডু গিয়ে দাঁড়ালেন কুন্তীর সামনে।

কুন্তী, আমার আরেকটি অনুরোধ তোমাকে রক্ষা করতে হবে। জানি, আমাকে তুমি বিমুখ করবে না।

বলুন আর্যপুত্র।

মাদ্রীর জন্য আর-একবার আহ্বানজানাতে হবে কোন দেবতাকে। আর-একটি পুত্র চাই মাদ্রীর।

কথাটা শোনামাত্র তীব্র জ্বালা ঝল্‌সে উঠল কুন্তীর দুই আয়ত আঁখিতে, ললাটে জাগল কুঞ্চনরেখা, গলায় ফুটল ক্রোধ— মহারাজ, মাদ্রী অত্যন্ত ধূর্ত, সে একবার দেব-আহ্বান করে দুই সন্তানের জননী হয়েছে। কুস্ত্রীদের স্বভাবই এই। আর এখন সে আর-একটি সন্তানের জননী হয়ে আমার পুত্রদের সমকক্ষ করে তুলতে চাইছে নিজের পুত্রদের। না মহারাজ, এ অনুরোধ আর করবেন না আমাকে। এ অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব নয় আমার পক্ষে।

প্রত্যাখ্যাত পাণ্ডুর চোখেমুখে অপমানের বেদনার পরিবর্তে কি চকিতে এক ঝলক স্বস্তির আভা দেখলেন কুন্তী? এক মুহূর্তের তৃপ্তি?

চলে গেলেন পাণ্ডু।

এবং, অবশেষে, ধরিত্রীর বুকে থমকে দাঁড়াল সেই বিশেষ দিনটি।

সমস্ত প্রকৃতি জুড়ে নিজের সবটুকু উজাড় করে ছড়িয়ে পড়েছে ঋতুরাজ বসন্ত। জ্বর-জ্বর হাওয়ায় নেশার উল্লাস। অশোকে-তিলকে, পলাশে-চম্পকে ছায়াছোঁয়া বনভূমি যেন প্রথম-সিঁদুরে-রঞ্জিতা নববধূ। সরোবরে পদ্ম, কুমুদ, কহ্লারের আলোমুখী প্রস্ফুটন। অরণ্যের গভীর গভীরে কোকিলের সুরেলা কুহু, ভ্রমরদলের একটানা গুঞ্জন। শীতঘুম ভেঙে জেগে উঠেছে প্রকৃতি।

নিঃসঙ্গ পাণ্ডু উদ্দেশ্যহীন ঘুরছেন বনপথে কোন গন্তব্য নেই, কারুর কাছে চাওয়ার নেই কিছু। তবুও যেহেতু অস্তিত্ব ঘিরে নেশাঝরা বসন্ত এবং যেহেতু তিনি এক রক্তমাংসের মানুষ, আজও পুরুষ – তাই হয়ত চেতনার কোন গোপন রন্ধ্রে কিছু অদৃশ্য

কীটের কামড়, কোন বিদ্যুৎবাহী সংকেতের চলাচল।

আর ঠিক তখন তাঁর পিছনে এক এখনও যুবতী নারী। পরনে বল্কল নয়, সূক্ষ্ম বসন। অঙ্গের প্রতিটি উপত্যকা দৃশ্যমান, আশ্চর্য বপনক্ষেত্র ইঙ্গিতবাহী।

বহুদিন পর সেই বিস্মৃতপ্রায় চাঞ্চল্যে অধীর হয়ে উঠলেন পাণ্ডু। শরীর জুড়ে সর্বগ্রাসী দাবানল। ঐ সুকোমল যৌবন, ঐ অনন্ত সুখের আকর তাঁর হাতের সীমায়। হাত বাড়ালেই পাওয়া যায়, ডুব দেওয়া যায় সেই হীরকখনিতে।

পাণ্ডার শরীর কাঁপছে, টলছে। দেখছেন মাদ্রী। প্রতীক্ষা করছেন সেই চরম মুহূর্তটির, যে মুহূর্তটির আশাতেই আজ তিনি এই নির্জন অরণ্যে এসেছেন স্বামীর পিছু পিছু। অভিশাপে বিশ্বাস করেন না মাদ্রী। সেই প্রথম দিনও করেন নি, আজও করেন না। দেব সংসর্গে আকাঙ্ক্ষিত তৃতীয় পুত্রটির জন্ম দেওয়ার সুযোগ তিনি পান নি সপত্নী কুন্তীর অসহযোগিতায়। কিন্তু সেই পুত্র তাঁর চাই, চাই-ই, যে-কোন মূল্যে। দেবগোষ্ঠীর কাউকে যখন পাওয়া যায় নি, তখন স্বামীর কথাই মনে পড়েছে তাঁর। শরীরী মাদকতায় প্রলুব্ধ করে স্বামীকে তিনি গ্রহণ করবেন নিজের মধ্যে। এবং মাদ্রী জানেন, বিশ্বাস করেন মনেপ্রাণে, সে মিলনে কোন ক্ষতিই হবে না স্বামীর। বরং ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে তাঁর এতদিনের অন্ধ সংস্কার।

সবলে মাদ্রীকে আলিঙ্গন করলেন পাণ্ডু। বড় তৃষ্ণা সেই আলিঙ্গনে। চেতনা লুপ্তপ্রায়। ঝরাপাতার শয্যায় একান্ত নিজস্ব নারী। বুভুক্ষু পাণ্ডু রত হলেন সঙ্গমে।

আর সেই সর্বস্বডোবা তীব্র সুখের মুহূর্তে মাথার মধ্যে সহসা বজ্রপাত। কোন্ দূরান্ত থেকে যে ভেসে আসে এক ভয়ংকর অমোঘ কণ্ঠস্বর ঃ সুখের সময় দুঃখ, স্ত্রীসংসর্গ করার সময়ই মৃত্যু হবে আপনার, মৃত্যু, মৃত্যু, মৃত্যু!

নিশ্চল অসাড় হয়ে গেলেন পাণ্ডু। চেষ্টা করলেন শ্বাস

টানার। ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠল থরথর করে, বিকৃত হল মুখ, দুই চোখে ফুটে উঠল আতঙ্কের হিমছায়া। তারপর নিথর হয়ে গেলেন মানুষটি। সম্পূর্ণ হল না তাঁর অন্তিম মিলন। হয়ত আকস্মিক আতঙ্কে, চিরাভ্যস্ত সংস্কারে ঋষিশাপের অনিবার্যতার কথা মনে পড়তে বিদ্রোহ করে বসল হৃদযন্ত্র অথবা রুদ্ধ হল মস্তিষ্কের কোন ক্রিয়া। শেষ ঘুম নামল অতৃপ্ত মানুষটির চোখ জুড়ে। অসাড় শরীরের নীচে শায়িতা অতৃপ্তা রমণীটি আর্তনাদ করে উঠলেন, কী হল মহারাজ. কী হল ?

দেহলগ্ন মানুষটি নিরুত্তর, স্পন্দনহীন। আতঙ্কিতা মাদ্রী স্বামীর দেহ আলিঙ্গন করে আর্তনাদ করতে লাগলেন উচ্চৈঃস্বরে। অনেকটা দূরে কুন্তী তখন পঞ্চভ্রাতার খেলা দেখছিলেন। মাদ্রীর কাতর আর্তনাদ কানে যেতে ছিটকে উঠে দাঁড়ালেন। শব্দ লক্ষ্য করে এগিয়ে চললেন দ্রুত পায়। তাঁর পিছু পিছু এগোলো পঞ্চভ্রাতা।

দূর থেকে কুন্তীকে আসতে দেখে অসহায় স্বরে চিৎকার করে উঠলেন মাদ্রী—ভদ্রে, ওরা যেন না আসে। তুমি একা এসো।

দাঁড়িয়ে পড়ল পাঁচ ভ্রাতা। উন্মাদিনীর মতো ছুটে গেলেন কুন্তী। কাছে গিয়ে থমকে গেলেন। বিবসনা মাদ্রীর শরীরে সংলগ্ন হয়ে নিস্পন্দ পড়ে আছেন পাণ্ডু। মুহূর্তের মধ্যে কুন্তী বুঝে নিলেন, কী ঘটেছে। তীব্র ধিক্কার ফুটে উঠল তাঁর গলায়, হায় অদৃষ্ট! আমি সবসময় আর্যপুত্রকে রক্ষা করে চলতাম, কখনও তাঁকে চঞ্চল হতে দিতাম না। এ তুমি কী করলে মাদ্রী ? কী করলে ? নির্জনে একা পেয়ে তাঁকে প্রলুব্ধ করলে এমনভাবে ? ঠেলে দিলে নিশ্চিত মৃত্যুর দিকে! হায় অদৃষ্ট। এ কী হল ?

প্রত্যুত্তরে কিছু হয়ত বললেন মাদ্রী। কথাগুলো কুন্তী শুনতেও পেলেন না। নিজেকে একটু সংযত করে নিয়ে বললেন, যা হওয়ার হয়েছে। এখন আমি যা বলি, শোনো। আমিই মহারাজের জ্যেষ্ঠা পত্নী। তাই আমি তাঁর সঙ্গে সহমরণে যাব। তুমি

ওঠো। আমাদের সন্তানদের সযত্নে প্রতিপালন কোরো।

মৃত স্বামীর আলিঙ্গন মুক্ত করে উঠে দাঁড়ালেন মাদ্রী। তাঁর সমস্ত অস্তিত্ব এখন শ্মশানের ছাই। মাথা নিচু করে মাদ্রী বললেন, আর্যে, স্বামীসহবাসে আজও পরিতৃপ্ত হই নি আমি। আজও আমার শরীর জুড়ে কামনার আগুন জ্বলে। তাছাড়া আমারই সঙ্গে মিলনকালে মৃত্যু ঘটেছে তাঁর। কাজেই সহমরণে যেতে হবে আমাকেই। তুমি আপত্তি কোরো না।

বলতে বলতে একটু থামলেন মাদ্রী, তারপর বললেন, আর, তোমার পুত্রদের আমি নিজের পুত্র মনে করে পালন করতে পারব, এমন বিশ্বাস আমার নেই। সে হবে আমার চরম পাপ। বরংআমার সন্তানদের তুমি নিজের সন্তান মনে করে পালন করতে পারবে। তুমি শুধু এইটুকু কোরো, আর কিছু চাই না আমি।

বিমূঢ়ের মতো দাঁড়িয়ে রইলেন কুন্তী। অরণ্যের মধ্যে থেকে তীব্র বিষফল সংগ্রহ করে আনলেন মাদ্রী। অকম্পিত হাতে ভক্ষন করলেন ফলগুলি। শেষবারের মতো এতদিনের পরিচিত পৃথিবীর ছবি চোখের মণিতে এঁকে নিয়ে, শুয়ে পড়লেন স্বামীর মৃতদেহ আলিঙ্গন করে। আর উঠলেন না।

সদ্যবিধবা এক নারী, পাঁচটি পুত্র এবং দুটি মৃতদেহ। শতশৃঙ্গ পর্বতের যাবতীয় ব্রাহ্মণ আর ঋষিরা গভীর চিন্তায় নিমগ্ন এখন কী করা কর্তব্য? মৃতদেহ দুটি এখানেই দাহ করে পাঁচ নাবালক পুত্রসহ ঐ নারীর এখানেই স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থ করা?

তা করাই যায়। কিন্তু ঐ সদ্যবিধবার বুকে যে স্বামী হারানো শোককে ম্লান করে দিয়ে জেগে উঠছে সেই চিরস্থায়ী স্বপ্ন : তাঁর সন্তানরা বনচরের জীবন কাটাবেনা, তাদের জন্যে বহুবছর প্রতীক্ষা-রত এক রমণীয় রাজপ্রাসাদ, সুখডুবো জীবন আর হয়ত-বা— যদিও অনিশ্চিত—জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরের জন্য হস্তিনাপুরের রাজ-

সিংহাসন। রানী থাকতে না পারার আক্ষেপ নেই, কিন্তু রাজমাতা হওয়ার দুর্নিবার বাসনা ছড়িয়ে আছে অবচেতনার গহনে।

মুখ খুলতে হয় কুন্তীকে, না, এখানে নয়। আমার সন্তানরা এবার নিজেদের রাজ্যে যাবে।

কণ্ঠস্বরে এতটুকু জড়তা নেই, দ্বিধা নেই। তাঁর সেই আত্ম-প্রত্যয়ী কণ্ঠস্বরে এমন কিছু ছিল, এমন এক অনমনীয় দৃঢ়তা, যে উপস্থিত বিপ্র ও ঋষিরা আর অন্য কোন প্রশ্ন করার জোর পেলেন না। শুধু সিদ্ধান্ত নেওয়া হল—সেক্ষেত্রে পাণ্ডু আরমাদ্রীর মৃত-দেহও হস্তিনাপুরে নিয়ে গিয়েই দাহ করা হবে।

জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির এখন কিশোর। বয়স তার পনের বছর। এত-গুলো বছরে এই অরণ্য-পর্বতের কঠিন জীবনে সে যথেষ্টই অভ্যস্ত। প্রকৃতির এই উদার ঐশ্বর্য আচ্ছন্ন করে রাখে তার মনকে। সে প্রশ্ন করে, আমরা কি আজই যাত্রা করব, মাতা ?

হ্যাঁ বৎস, আজই। অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে, আর নয়। তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও।

শতশৃঙ্গ পর্বত থেকে শুরু হল এক দীর্ঘযাত্রা। অসংখ্য ব্রাহ্মণ আর ঋষি পায়ে পা মিলিয়ে পথে নামলেন। শোভাযাত্রা এগিয়ে চলল হস্তিনাপুরের দিকে। বহুবছর পর শ্বশুরালয়ের পথে এগোলেন কুন্তী। শুরু হল তাঁর প্রত্যাবর্তন আর জীবনের এক নতুন অধ্যায়, যেখানে তিনি কারও কন্যা নন, জায়া নন, যেখানে তিনি শুধুই জননী।

৬

আজ কুরু-পাণ্ডব রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষার পরীক্ষা। রঙ্গ-ভূমির সীমা পরিমাপ করে দিয়েছেন আচার্য দ্রোণ। রঙ্গভূমিটি সমতল, পরিচ্ছন্ন। চারপাশে কয়েকটি প্রস্রবণ ও জলাশয়। বিস্তীর্ণ এক দর্শনাগার তৈরি করেছেরাজশিল্পীরা। নারীদের জন্য নির্মিত হয়েছে পৃথক দর্শনাগার। ধৃতরাষ্ট্রের একশটি পুত্র এবং পঞ্চপান্ডব

আজ হস্তিনাবাসীদের সামনে মেলে ধরবেন নিজেদের যাবতীয় অস্ত্র-নৈপুণ্যে, ছাপিয়ে যেতে চেষ্টা করবেন পরস্পরকে। অসংখ্য মানুষ পরম কৌতূহলে দেখতে এসেছে রাজকুমারদের দক্ষতা। নিচুতালে বাজনা বাজাচ্ছে বাদ্যকররা। রঙ্গভূমিতে উপস্থিত হয়েছেন মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র, কুরুগৌরব ভীষ্ম, আচার্য কৃপ, মহামন্ত্রী বিদুর। নারীদের সারিতে এসে বসেছেন বদ্ধনয়না গান্ধারী এবং কুন্তী।

কুন্তীর ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা। চিন্তা একজনকে নিয়েই: ভীমসেন। যুধিষ্ঠির, নকুল বা সহদেব বিশেষ কারও প্রতিদ্বন্দ্বী নয়। তাদের জন্য বিশেষ দুশ্চিন্তারও তাই অবকাশ নেই কুন্তীর। আর অর্জুনের সম্বন্ধে তো কোন প্রশ্নই ওঠে না। সহজাত প্রতিভা আর আচার্য দ্রোণের তত্ত্বাবধানে দীর্ঘদিনের অনুশীলনে সে পরিণত হয়েছে শ্রেষ্ঠ ধনুর্বিদে। নিরঙ্কুশ তার শ্রেষ্ঠত্ব। তৃতীয় পাণ্ডব আজ অপ্রতিদ্বন্দ্বী। না, অর্জুনকে নিয়েও তাই দুশ্চিন্তায় পড়তে হয় নি কুন্তীকে। কিন্তু মধ্যম ভীমসেন? কুন্তী উদ্বিগ্না। ভীমসেন অপ্রতিদ্বন্দ্বী নয়। গদাযুদ্ধে তার সমকক্ষ অথবা শ্রেষ্ঠতর হয়ে উঠেছে গান্ধারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র দুর্যোধন। তাতেও হয়ত উদ্বেগের তেমন কারণ ছিল না, কারণ এটা রণক্ষেত্র নয়, অস্ত্র-শিক্ষার প্রদর্শন মাত্র। কিন্তু ঘটনাস্রোত যেদিকে এগিয়েছে, তাতে উদ্বেগের কিছু সঙ্গত কারণ আছে পাণ্ডবজননীর।

শতশৃঙ্গ থেকে যাত্রা শুরু করে ঠিক সতের দিন পর পদযাত্রীরা পৌঁছেছিলেন হস্তিনাপুরের রাজপ্রাসাদে। সত্যবতী, ভীষ্ম, অম্বিকা-অম্বালিকারা গ্রহণ করেছিলেন তাঁদের, কিন্তু কোথাও একটা সংশয়ের কাঁটা রয়েই গিয়েছিল। ব্রাহ্মণদের কথায় কুরু-বংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে গৃহীত হয়েছিল যুধিষ্ঠির, কিন্তু সংশয় দূর হয় নি তাতে। কুন্তী বুঝেছিলেন। এই পাঁচ পুত্রের কারোরই জন্মসংবাদ পাঠানো হয় নি হস্তিনাপুরে। কেন পাঠানো হয় নি, হস্তিনাবাসীর মনে সে প্রশ্ন জাগা একান্তই স্বাভাবিক। তবু, ভীষ্মের উদ্যোগে, পঞ্চপাণ্ডব এবং কুন্তী রাজপ্রাসাদে স্থান পেয়ে-

ছিলেন সসম্মানেই। দিনে দিনে বিষয়টা সহজ, স্বাভাবিক হয়ে এসেছে সকলের কাছেই। কিন্তু একজন আজও পারে নি পাণ্ডবদের মেনে নিতে আর সেই একজনই ভীমসেনের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী: দুর্যোধন। মানতে না পারার কারণটাও অস্পষ্ট নয়। রাজপদের উত্তরাধিকার নিয়ে ইতিমধ্যেই একটা জটিল প্রশ্ন মাথাচাড়া দিতে শুরু করেছে। প্রাক্তন নৃপতি পাণ্ডুর আর এই কুরুবংশের জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে রাজপদ যুধিষ্ঠিরের প্রাপ্য, নাকি বর্তমান নৃপতি ধৃতরাষ্ট্রের জ্যেষ্ঠ সন্তান হিসেবে সে পদের ন্যায্য উত্তরাধিকারী দুর্যোধন? এখনও ততটা সোচ্চার হয়ে ওঠেনি প্রশ্নটা, কিন্তু গুঞ্জন চলছেই। সেইসঙ্গে গান্ধার থেকে এসে জুটেছেন গান্ধারীর ভ্রাতা শকুনি। রাজনীতিবিশারদ, তীক্ষ্ণবুদ্ধি মানুষ। দুর্যোধনকে তিনি প্ররোচিত করছেন রাজপদে অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য। তবে, স্বীকার করতে কুন্তী বাধ্য, ভীমসেনের দুর্ব্যবহারও দুর্যোধনদের ক্রোধের একটা বড় কারণ। সুযোগ পেলেই দুর্যোধনের অনুজদের ওপর নানা ধরনের অত্যাচার করে ভীমসেন। ব্যাপারটা ভাল চোখে দেখে না দুর্যোধন। সুযোগ পেলে প্রত্যাঘাত করতে দ্বিধা করবে না সে। কুন্তীর কপালে তাই দুশ্চিন্তার আঁকিবুকি।

আরেকটি ঘটনাও ঘটে গেছে ইতিমধ্যে। দুই পুত্রবধূ অম্বিকা আর অম্বালিকাকে নিয়ে বনবাসে চলে গেছেন সত্যবতী।

রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন আচার্য দ্রোণ। শুভ্র বসন, শুভ্র কেশ, শ্বেতচন্দনে চর্চিত অবয়ব, গলায় শ্বেতপুষ্পের মালা। বড় সুন্দর দেখাচ্ছে বর্ষীয়ান মানুষটিকে। পাশে তাঁর পুত্র অশ্বত্থামা। আচার্যতনয় অশ্বত্থামাও যে ধনুর্বিদ্যায় অত্যন্ত নিপুণ, তা জানেন কুন্তী।

বলি দেওয়া হল। মন্ত্রজ্ঞ ব্রাহ্মণরা সমাপন করলেন মাঙ্গলিক ক্রিয়া। নির্দিষ্ট স্থানে প্রয়োজনীয় অস্ত্রশস্ত্র রেখে গেল অনুচররা।

পরক্ষণেই তুমুল হর্ষধ্বনিতে মুখর হয়ে উঠল দর্শকবৃন্দ। কুন্তী দেখলেন, যুধিষ্ঠিরকে পুরোবর্তী করে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ

করছে রাজকুমাররা।

শুরু হল অস্ত্রশিক্ষার প্রদর্শন। রথে চড়ে বিচিত্র কৌশলে শরনিক্ষেপ করছে রাজকুমাররা, বিদ্ধ করছে চলমান লক্ষ্যবস্তু, তরবারির সাহায্যে প্রতিহত করছে বহু অস্ত্রের আঘাত।

শিক্ষা প্রদর্শন শেষ করে আস্তে আস্তে সরে গেল রাজকুমাররা। আর তখন, এই সেই কুন্তীর আতঙ্কের প্রহর, মুখোমুখি এসে দাঁড়াল দুই প্রতিদ্বন্দ্বী—ভীম আর দুর্যোধন। দুটি সুগঠিত শরীর গদা হাতে নিয়ে পরস্পরের সম্মুখীন হল।

কেঁপে উঠলেন কুন্তী। পাশে বসা গান্ধারী প্রশ্ন করলেন, এবার কিসের পরীক্ষা হচ্ছে, কুন্তী?

কুন্তীর উত্তরে কাঁপন, ভীমসেন আর দুর্যোধন গদাযুদ্ধে অবতীর্ণ হচ্ছে, আর্যে।

একটু কি কেঁপে উঠলেন গান্ধারীও?

ধৃতরাষ্ট্র বিদুরকে শুধোলেন, রঙ্গভূমিতে এখন কিসের আয়োজন চলছে, বিদুর?

স্থিতধী মানুষটি উত্তর দিলেন, ভীমসেন আর দুর্যোধন গদা হাতে মুখোমুখি হচ্ছে পরস্পরের।

একটু যেন চঞ্চল হয়ে উঠলেন ধৃতরাষ্ট্র।

শুরু হল গদাযুদ্ধ। দুজনেই সুশিক্ষিত, দুজনেই দক্ষ। দর্শকরা বিভক্ত হয়ে গেছে দু'ভাগে। কারুর সমর্থন দুর্যোধনের দিকে, কেউ ভীমসেনের পক্ষপাতী। তাদের আবেগতাড়িত চিৎকারে উত্তেজিত হয়ে উঠছে দুই যুযুধান প্রতিদ্বন্দ্বী। বেড়ে উঠছে নিজের নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের জেদ।

শিউরে উঠলেন কুন্তী। দুর্যোধনের প্রচণ্ড আঘাত থেকে কোনক্রমে আত্মরক্ষা করেছে ভীমসেন। পরমুহূর্তেই ভীমসেনের প্রত্যাঘাতে ছিটকে সরে যেতে হল দুর্যোধনকে। স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন কুন্তী।

কিন্তু উত্তেজনা বেড়েই চলেছে। পরস্পরকে চরম আঘাত

হানার জন্য ক্রমেই উগ্র হয়ে উঠছে দুই যোদ্ধা। অস্ত্রশিক্ষার প্রদর্শন পরিণত হচ্ছে মরণপণ যুদ্ধে।

অশ্বত্থামাকে নির্দেশ দিলেন দ্রোণাচার্য, বৎস, ওদের দুজনকে এখনই নিবৃত্ত করো।

এগিয়ে গেলেন অশ্বত্থামা। ঘোষণা করলেন—গদাযুদ্ধ শেষ। পরস্পরের দিকে ক্রুদ্ধ দৃষ্টিতে তাকাতে তাকাতে দুদিকে সরে গেল দুই তুল্যমূল্য প্রতিদ্বন্দ্বী।

দ্রোণাচার্যের নির্দেশে থেমে গেল বাদ্যধ্বনি। উচ্চকণ্ঠে আচার্য দ্রোণ সেই ঘোষণাটি করলেন, যার জন্য এতক্ষণ অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল দর্শকমণ্ডলী। দ্রোণ বললেন—এবার আপনাদের সামনে অস্ত্রশিক্ষা প্রদর্শন করতে আসছেন আমার পুত্রের থেকেও প্রিয়তর, সর্বশাস্ত্রবিশারদ, ইন্দ্রতুল্য মহাবীর পাণ্ডুতনয় অর্জুন।

আকাশ-কাঁপানো গর্জনে ফেটে পড়ল রঙ্গভূমি। অর্জুন আসছে, অর্জুন। সেই অসাধারণ ধনুর্ধর, সেই বিস্ময়কর তরুণ প্রতিভা! দর্শকরা উত্তেজনায় টানটান আর অর্জুনজননী কুন্তী গর্ব এবং স্বস্তিতে দুশ্চিন্তামুক্ত। যাকে নিয়ে দুশ্চিন্তা, তার পরীক্ষা অতিক্রান্ত। কোন অঘটন ঘটেনি। কিন্তু এখন লক্ষ চোখের সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে যে সন্তানটি, তাকে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঠেলে দেওয়ারমতো কোন নাম কুন্তীর জানা নেই। সে অপরাজেয়, শ্রেষ্ঠ, নিরঙ্কুশ। গভীর চোখে পুত্রের দিকে তাকালেন কুন্তী।

সত্যিই আশ্চর্য দক্ষতা অর্জুনের। ধনুর্বিদ্যার সবটুকু সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছেন তিনি। কত বিচিত্র অস্ত্রে তাঁর অনায়াস অধিকার! আগ্নেয়াস্ত্র, বরুণাস্ত্র, বায়ব্যাস্ত্র, পার্জন্যাস্ত্র, ভৌমাস্ত্র, পার্বতাস্ত্র। একান্ত দুরূহ লক্ষ্যবস্তুগুলি অবহেলায় বিদ্ধ করল তরুণ ধনুর্বিদ। ঘূর্ণ্যমান লৌহবরাহের মুখে একযোগে বিদ্ধ হল অর্জুন-নিক্ষিপ্ত পাঁচটি বাণ। রজ্জুতে বাঁধা চলমান গোশৃঙ্গনির্মিত কোষে নিক্ষিপ্ত হল একুশটি তীক্ষ্মমুখ শর। তরবারি আর গদাহাতেও নৈপুণ্যের পরিচয় দিল তৃতীয় পাণ্ডব।

তৃপ্ত দর্শকরা তুমুল চিৎকারে অভিনন্দন জানাল কৃতী ধনুর্ধরকে। শিষ্যের কৃতিত্বে সাফল্যের হাসিতে ভরে উঠল আচার্য দ্রোণের মুখ। গর্বিতা কুন্তীর দুই নয়নে স্নেহের প্রগাঢ় ছায়া।

অনুষ্ঠান শেষ। থেমে গেছে বাদ্যধ্বনি। দর্শকরা ফিরে যাচ্ছে যে যার আশ্রয়ে। ঠিক এমনি সময়…

ঠিক এমনি সময় রঙ্গভূমির বাইরে থেকে ভেসে এল বজ্রনির্ঘোষের মতো এক উদাত্ত কণ্ঠস্বর, অপেক্ষা করুন, আমি আসছি।

চমকে উঠল জনতা। কে? কে আসে? কার কণ্ঠনিঃসৃত এই উদাত্ত কণ্ঠস্বর? প্রতিটি চোখ তখন রঙ্গভূমির প্রবেশদ্বারের দিকে। অশ্বত্থামা আর উনশত ভ্রাতায় পরিবেষ্টিত দুর্যোধন উঠে দাঁড়িয়েছে উত্তেজনায়। ওদিকে চার ভ্রাতার সঙ্গে দাঁড়িয়ে উৎসুক দৃষ্টিতে প্রবেশদ্বারের দিকে তাকিয়ে আছেন অর্জুন। আর কুন্তী উদ্বেল নতুনতর উদ্বেগে। কে আসে?

মানুষের ভীড় ঠেলে রঙ্গভূমির মধ্যস্থলে এসে দাঁড়াল এক উজ্জ্বল যুবক। বলিষ্ঠ, রূপবান, আত্মপ্রত্যয়ী। কানে কুণ্ডল, অঙ্গে দুর্ভেদ্য বর্ম। এই যুবককে এখানে অনেকে চেনে, অনেকে চেনে না। আচার্য দ্রোণের কাছে অস্ত্রশিক্ষার জন্যও এসেছিল এই যুবক। নাম তার কর্ণ।

দ্রোণাচার্য আর কৃপাচার্যকে প্রণাম জানালেন কর্ণ। তাঁর সন্ধানীদৃষ্টি অতঃপর খুঁজে নিল অর্জুনকে। গম্ভীর স্বরে বললেন, অর্জুন, এতক্ষণ তুমি যা যা করেছ, আমিও তা করে দেখাচ্ছি।

আবার টানটান হয়ে উঠল দর্শকমণ্ডলী। ভাঙা হাটে এ কোন্ নতুন আগন্তুকের পদার্পণ? দুর্যোধনের চোখেমুখে প্রত্যাশার দীপ্তি। অর্জুন কিছুটা অপমানিত, ক্রুদ্ধ। আর কুন্তী সন্ত্রস্তা। অর্জুন, তাঁর পরমপ্রিয় অপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুন, তাহলে কি নিরঙ্কুশ নয়?

নির্দেশ দিলেন আচার্য দ্রোণ। ধনুর্বাণ হাতে এগিয়ে এলেন

কর্ণ। কোন অসাধারণ ঐন্দ্রজালিকের জাদুর প্রভাবে যেন সম্মোহিত হল প্রতিটি মানুষ। হ্যাঁ, যা যা করেছিলেন অর্জুন, যতকিছু অসম্ভব নৈপুণ্য বেরিয়ে এসেছিল তাঁর তূণীর থেকে, তার প্রতিটি অনায়াসে করে গেলেন কর্ণ। একইরকম অব্যর্থ, সমান অভ্রান্ত।

না, তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন তাহলে অপ্রতিদ্বন্দ্বী নয়! পঞ্চপাণ্ডবকে নিয়ে যে ভীতি দিন দিন বেড়ে উঠছিল দুর্যোধনের মধ্যে, তা ভীমসেনকে কেন্দ্র করে নয়, ভীতির একমাত্র উৎস ছিল অর্জুনই। অর্জুনকে প্রতিহত করার মতো কোন ধনুর্বিদকে এতদিন খুঁজে পায় নি দুর্যোধন। কিন্তু আজ এই রঙ্গভূমিতে এসে দাঁড়িয়েছে সেই আকাঙ্খিত মানুষটি। অর্জুনের সমকক্ষতার, কিংবা তার থেকেও শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছে সে।

এগিয়ে গেল দুর্যোধন। উষ্ণ আলিঙ্গনে কর্ণকে স্বাগত জানিয়ে বলল, হে মহাবীর, আমাদের পরম সৌভাগ্যে আমরা পেয়েছি তোমাকে। বলো তুমি কী চাও?

কর্ণ হাসলেন, আমি শুধু তোমার বন্ধুত্ব চাই আর চাই অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করতে।

দুর্যোধন উত্তর দিল, আমাদের বন্ধুত্বের বন্ধন কোনদিন শিথিল হবে না, মহাবীর। আর দ্বন্দ্বযুদ্ধের ক্ষেত্রেও কোন বাধা আছে বলে মনে হয় না।

জীবনে এত বড় অপমানের সম্মুখীন আর কখনও হতে হয় নি অর্জুনকে। পদাহত সাপের মতো উঠে দাঁড়াল অর্জুন, চোখেমুখে তার তীব্র ক্রোধের বিচ্ছুরণ, রে কর্ণ, যারা অনাহূত হয়ে উপদেশ দেয় আর যারা অনাহূত হয়েও কথা বলে, তাদের একমাত্র পরিণতি মৃত্যু। আজ তোরও মৃত্যুর দিন ঘনিয়ে এসেছে।

কর্ণ শান্ত, অর্জুন, এই রঙ্গভূমি তো সর্বসাধারণের। এখানে কারুর বিশেষ অধিকারের, আহূত অথবা অনাহূতের প্রশ্ন তো ওঠে না। কাজেই বৃথা বাক্যব্যয়ে লাভ নেই। দ্বন্দ্বযুদ্ধেই মীমাংসা

হোক শ্রেষ্ঠত্বের।

এই আহ্বানের পর ফেরার পথ আর থাকতে পারে না। উদ্যোগী হলেন আচার্য দ্রোণ। অর্জুনকে আশীর্বাদ করে বললেন, যাও বৎস, প্রমাণ করো নিজেকে।

কর্ণকে আলিঙ্গন করল দুর্যোধন, যাও বীর, আমরা প্রত্যক্ষদর্শী হই তোমার শ্রেষ্ঠত্বের।

দর্শকবৃন্দ আবার দুভাগে বিভক্ত। একদল চাইছে অর্জুনের জয়, অন্যদল দেখতে চাইছে কর্ণের পরাক্রম। নারীদের মধ্যেও স্পষ্ট দুটি ভাগ।

কিন্তু, কুন্তী?

কুন্তীর চেতনা অসাড়প্রায়। ঐ অচেনা যুবকটিকে, নাম যার কর্ণ, তিনি দেখেছেন। দেখেছেন তার দক্ষতা, কুশলতা, পরাক্রম। তার শান্ত, আত্মপ্রত্যয়ী আচরণে প্রমাণ পেয়েছেন মানসিক শক্তির। কুন্তীর চিন্তাচেতনা মথিত করে জেগে উঠছে এক বোধ: পারবে না, অর্জুন পারবে না, ঐ যুবকের হাতে অর্জুনের পরাজয় আজ অবধারিত। আর শুধু পরাজয়ই নয়, দ্বন্দ্বযুদ্ধের চরম পরিণতি মৃত্যু। অর্জুন, তাঁর কনিষ্ঠ সন্তান, ইন্দ্রপুত্র, বুক-তোলপাড় স্নেহের ফসল—তার মৃত্যু? আজই? এখনই? তাঁর চোখের সামনেই?

না!

সংজ্ঞা হারিয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন কুন্তী। আর্তনাদ করে উঠলেন কয়েকজন মহিলা। হৈ-চৈ, ব্যস্ততা।

ছুটে এলেন অনেকে। কিন্তু সবার আগে ছুটে এলেন যে মানুষটি, তিনি বিদুর। বিদুর এসে দেখলেন, কুন্তী সংজ্ঞাহারা। কর্ণ-অর্জুনের দ্বন্দ্বযুদ্ধের প্রস্তুতি দেখতে দেখতে এমন একটা আশঙ্কাই এতক্ষণ করছিলেন বিদুর। পরিচারিকাদের দ্রুত চন্দনমিশ্রিত জলসেচন করার আদেশ দিলেন তিনি। তাদের পরিচর্যায় কিছুক্ষণের মধ্যেই সংজ্ঞা ফিরে পেলেন কুন্তী। উঠে

বসলেন। উঠে বসেই তাঁর চোখ খুঁজতে চাইল অর্জুনকে। অর্জুন ...কোথায় সে...

রঙ্গভূমির মাঝখানে প্রস্তুত হয়ে দাঁড়িয়ে আছে দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। কুরুকুলবধূ আকস্মিক সংজ্ঞা হারানোয় সাময়িকভাবে স্থগিত রাখা হয়েছিল শ্রেষ্ঠত্বের পরীক্ষা।

ভরসা করার মতো একমাত্র মানুষটির দিকে মিনতিভরা দৃষ্টিতে তাকালেন কুন্তী। আমূল কেঁপে উঠলেন বিদুর। এই সেই চোখ, এই সেই বুক-পোড়ানো চাহনি।

চোখের ইশারায় কুন্তীকে আশ্বস্ত করে দ্রুত পায়ে বিদুর এগিয়ে গেলেন কৃপাচার্যের দিকে।

বিদুরের ইঙ্গিতে একটু যেন থমকে গেলেন বৃদ্ধ কৃপাচার্য। বড় অন্যায় নির্দেশ দিচ্ছেন মহামন্ত্রী। তবু, আদেশ পালনে তিনি বাধ্য।

রঙ্গভূমিতে গিয়ে দাঁড়ালেন আচার্য কৃপ। সমগ্র দর্শকমণ্ডলীকে শুনিয়ে উচ্চকণ্ঠে কর্ণকে বললেন, হে মহাবাহো, কুন্তীগর্ভসম্ভূত মহারাজ পাণ্ডুর তৃতীয় পুত্র অর্জুন তোমার সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করবেন। এখন তুমি নিজের মাতা-পিতার নাম উল্লেখ করো এবং কোন্ কুলে জন্মগ্রহণ করেছ আর কোন্ রাজবংশ অলংকৃত করেছ, তা স্পষ্ট করে বলো। তোমার পরিচয় পেলে তবেই অর্জুন তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী হতে পারেন, অন্যথায় তা সম্ভব নয়। কারণ রাজকুমাররা অজ্ঞাতকুলশীল কোন ব্যক্তির সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হন না।

দুঃসহ লজ্জায় যেন কেঁপে উঠল চরাচর। জনতার উল্লাসধ্বনি মুহূর্তে স্তব্ধ। এ কী আশ্চর্য উক্তি আচার্যের? কর্ণ কে, তা কি জানেন না তিনি? জানা নেই আচার্য দ্রোণের? অশ্বত্থামার? এমনকি স্বয়ং তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনও কি জানেন না তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীটির পরিচয়? আচার্য দ্রোণের কাছে অস্ত্রশিক্ষার জন্য তো আগেই এসেছিলেন কর্ণ। তাহলে?

কর্ণ লজ্জায় নতমুখ। আচার্যের এ প্রশ্নের কী উত্তর দেবেন

তিনি ? সব জেনেই যে এই অমোঘ শরটি নিক্ষেপ করেছেন আচার্য কৃপ, তা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কেন করেছেন, তা-ও দিনের আলোর মতো স্পষ্ট তাঁর কাছে। কর্ণ নিরুত্তর, নির্বাক।

কিন্তু দুর্যোধন উত্তেজিত। দ্রোণাচার্যের সামনে এগিয়ে গেল দুর্যোধন, হে আচার্য, শাস্ত্রমতে যিনি সৎকুলে উদ্ভূত, বীর এবং সৈন্যচালনে সমর্থ, তাঁর সঙ্গেই যুদ্ধ করা যায়। তবুও যদি অর্জুন রাজা ব্যতিরেকে অন্য কারুর সঙ্গে যুদ্ধ করতে সম্মত না হয়, তাহলে শুনুন আচার্য, শুনুন উপস্থিত দর্শকমণ্ডলী—এই মুহূর্তেই কর্ণকে আমি অভিষিক্ত করছি অঙ্গরাজ্যের রাজপদে।

রঙ্গভূমি স্তম্ভিত। দুর্যোধনের এ ঘোষণা প্রত্যাশিত ছিল না কারুরই। এ অধিকার দুর্যোধনের আছে কিনা, তা-ও সন্দেহের বিষয়। কিন্তু জন্মান্ধ মহারাজ ধৃতরাষ্ট্র যে তাঁর একান্ত প্রিয়, দৃষ্টিহীন জীবনের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ এই জ্যেষ্ঠ পুত্রটির কথা অস্বীকার করতে পারবেন না, সেটাও অবিদিত নয় কারুর।

এতটুকু দেরী করতেও রাজি নয় দুর্যোধন। বন্ধু বলে স্বীকার করেছে যাকে, তার এই তীব্র অপমান যেন দুর্যোধনের নিজেরই অপমান। ব্রাহ্মণদের আহ্বান জানাল দুর্যোধন। কাঞ্চনময় সিংহাসনে বসানো হল বিমূঢ় কর্ণকে। মন্ত্রপাঠ করলেন ব্রাহ্মণরা। লাজ, কুসুমআর সুবর্ণের অর্ঘ্যে কর্ণ অভিষিক্ত হলেনঅঙ্গরাজ্যের রাজপদে। তাঁর মাথায় ধরা হল রাজছত্র, চামরব্যজন করল পরিচারকরা, বন্দিরা দিল জয়ধ্বনি। অজস্র বিস্মিত চোখের সামনে সম্পূর্ণ হল অনুষ্ঠান।

উঠে দাঁড়ালেন আপ্লুত কর্ণ। বললেন, দুর্যোধন, তোমার এই মহানুভবতার প্রতিদানে আমি কী দিতে পারি তোমাকে, বন্ধু ?

হাসল দুর্যোধন, বন্ধুত্ব। আজীবনের বন্ধুত্ব, কর্ণ।

কর্ণের গলায় ঢেউ তুলল অনন্ত কৃতজ্ঞতা, নিশ্চিন্ত থাকো, সখা। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত এই কর্ণ তোমার বন্ধুই থাকবে।

উষ্ণ আলিঙ্গনে বাঁধা পড়ল দুই মিত্র। এ বড় সুখের সময়, এ বড় প্রাপ্তির অবসর।

ঠিক সেই মুহূর্তে রঙ্গভূমিতে প্রবেশ করলেন একজন মানুষ। ঘর্মাক্ত, বসনভূষণ এলোমেলো, টলোমলো শরীর। উদ্‌ভ্রান্তের মতো চারিদিকে তাকাতে গিয়ে কর্ণকে দেখতে পেলেন মানুষটি। ছুটে গেলেন। ততক্ষণে দ্রুত পায়ে এগিয়ে এসেছেন কর্ণও। মানুষটিকে প্রণাম করলেন তিনি। বললেন, পিতা, আপনি এখানে?

পুত্রকে আলিঙ্গন করে কম্পিত স্বরে উত্তর দিলেন, মানুষটি তোমারই সন্ধানে, বৎস।

মানুষটি মহারাজ ধৃতরাষ্ট্রের একদা-সখা সারথি অধিরথ। এই হস্তিনানগরে তাঁকে চেনে না, এমন প্রায় কেউই নেই। আর কর্ণ যে তাঁরই পুত্র, সেটাও অনেকেরই জানা।

এতক্ষণে সুযোগ পেল ভীম। বিদ্রূপ ঝলসে উঠল তার গলায়, আহা রে সূতনন্দন, রণক্ষেত্রে অর্জুনের হাতে প্রাণ দিতে চাস তুই? না না, সেটা মোটেই শোভন হবে না। বরং বংশের বৃত্তি অবলম্বন করে এখনই রথের বল্‌গা গ্রহণ কর্। হুঃ, সারথির পুত্র রাজা হয়েছে! ওরে নরাধম, যজ্ঞের হবিঃ যেমন কুকুরের জন্য নয়, তেমনি তুইও অঙ্গরাজ্য উপভোগের উপযুক্ত নোস।

অপমানে, ক্রোধে থরথর করে কেঁপে উঠল কর্ণের ঠোঁট দুটি। হয়ত কিছু বলতে চাইলেন, পারলেন না। কথা হারিয়ে যাচ্ছে। উঠে আসছে জ্বালার হলাহল।

কিন্তু প্রত্যুত্তর দেওয়ার জন্য আরও একজন আছে। জ্যামুক্ত তীরের মতো ছিটকে উঠে দাঁড়াল দুর্যোধন। বন্ধুর অপমানে তার চোখমুখ লাল। বলল, ভীম, কর্ণ সম্বন্ধে এ রকম কটূক্তি করা তোমার উচিত নয়। মনে রেখো, ক্ষত্রিয়দের প্রকৃত পরিচয় তাদের শক্তিমত্তায়। আর কর্ণের জন্মের কথা বলছ? তাহলে তোমরা কী? তোমাদের কিভাবে জন্ম হয়েছে, তা তো কারুর অজানা

নেই। অঙ্গরাজ্য তো সামান্য বিষয়, কর্ণ ইচ্ছে করলে নিজের শক্তিতে সমগ্র পৃথিবী জয় করতে পারেন।

চিৎকার করে উঠল দর্শকরা। কারুর মুখে কর্ণের জয়ধ্বনি, কেউ সাধুবাদ দিচ্ছে অর্জুনকে, আবার কেউ-বা দুর্যোধনের সমর্থনে সোচ্চার। ওদিকে পশ্চিম দিগন্তে সূর্যদেব তখন দিনের ক্লান্তি মুছে ফেলে ঘুমিয়ে পড়ছেন চুপি চুপি।

কর্ণকে সঙ্গে নিয়ে রঙ্গভূমি থেকে বেরিয়ে গেল দুর্যোধন। দ্রোণ, কৃপ ও পিতামহ ভীষ্মের সঙ্গে প্রাসাদে ফিরল পাণ্ডবরা। জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নীরব, চিন্তামগ্ন। অর্জুনের শ্রেষ্ঠত্বে এতদিন কোন সংশয় ছিল না তাঁর। কিন্তু আজ, এই মুহূর্তে, মাথায় তার অন্য ভাবনা, ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা। যতটুকু দেখেছেন, তাতে কর্ণকে অর্জুনের থেকে শ্রেষ্ঠতর বলেই মনে হয়েছে যুধিষ্ঠিরের। এক তীব্র ভীতি ধীরে ধীরে গ্রাস করছে তাঁকে। ঐ অসাধারণ ধনুর্ধর যদি ধনুর্বাণ হাতে এসে দাঁড়ায় দুর্যোধনের পাশে, তাহলে…যুধিষ্ঠিরের মন জুড়ে আশঙ্কার মেঘ।

আর কুন্তী?

ক্লান্ত, বিধ্বস্ত কুন্তী ঘরে ফিরলেন। বুকভরা শূন্যতা, চোখ জুড়ে ভবিষ্যতের মরণগন্ধী ছায়া। ঐ উন্নতদেহী, উজ্জ্বল নয়ন, সুদর্শন যুবকটিকে দেখলে ভালবাসতে ইচ্ছে করে। কত বয়স হবে ঐ যুবকের? অর্জুনের থেকে কয়েক বছরের বড়ই হবে হয়ত। ইচ্ছে করে ভালবাসতে, স্নেহচ্ছায়ায় ঘিরে রাখতে—যেভাবে ঘিরে রাখেন তাঁর পাঁচ পুত্রকে। আর তখনই মনে পড়ে বহু বহু বছর আগেকার সেই ঝাপ্‌সা ছবি, যেখানে মঞ্জুষার অনিশ্চিত আশ্রয়ে এক সদ্যোজাত শিশু, তার কান্না, জন্মদাত্রীকে কাছে পাওয়ার আকুতি আর ভেসে যাওয়া ভেসে এক নিশ্চিত ঠিকানায়, যেখানে রাজত্ব করে দোর্দণ্ডপ্রতাপ মৃত্যু স্বয়ং…অশ্বনদীর তাথৈ স্রোতে দোদুল দোলা, কান্নার ক্ষীণ শব্দ বিলীন…অন্ধকার, অন্ধকার… নদীর তটে সব-হারানো এক কিশোরী…আহ্, যদি সে বেঁচে

থাকত, সেই স্রোতভাসা শিশু, হয়ত আজ এত বড়টাই হয়ে উঠত, ঐ যুবকের মতো, সুদর্শন, সৌম্য, বীর। ভালবাসতে ইচ্ছে করে, ভীষণ ভীষণ ইচ্ছে করে।

কিন্তু, ঐ যুবক যে ভিন্ন পথের যাত্রী! সে আমার অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী। দুর্যোধনের সখা। ও যে আমার বুক থেকে কেড়ে নিতে চায় আমার কনিষ্ঠ পুত্রটিকে, আমার পরম মমতায় গড়া অর্জুনকে! অর্জুন, আমার অপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে এসে দাঁড়িয়েছে ও। সর্বনাশের কোন্ রসাতল ফুঁড়ে উঠে এল ঐ লাবণ্যময় যুবক? আহ্, সত্যি কথাটা স্বীকার করতে এত সংকোচ হচ্ছে কেন? ও শুধু অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বীই নয়, আমার সমস্ত বোধবুদ্ধি যে ডুকরে উঠে বলতে চাইছেঃ ও শ্রেষ্ঠতর, অর্জুনের মৃত্যুবাণ লুকিয়ে আছে ওরই তূণীরে!

না। না! সরে যাও ভালবাসা, পুড়ে ছাই হও স্নেহ। আমার অর্জুনকে আমায় রক্ষা করতেই হবে, প্রয়োজনে সর্বস্ব দিয়েও।

পরিচারিকাকে আহ্বান করলেন কুন্তী। প্রকোষ্ঠে এসে দাঁড়াল পরিচারিকা। কুন্তী বললেন, মহামন্ত্রী বিদুরকে সংবাদ দাও। বলো, এখনই যেন আসেন তিনি।

যথা আজ্ঞা।

চলে গেল পরিচারিকা। ব্যাকুল জননী উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন দুয়ারের দিকে।

আসন গ্রহণ করে বিদুর কথা বললেন খুব নীচু গলায়, বলুন আর্যে।

কুন্তী নির্বাক। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করে বিদুরই বললেন, জানি আর্যে, আজ আপনি অত্যন্ত উতলা হয়ে আছেন। তার কারণও আমার অজানা নয়।

এতক্ষণে কথা বললেন কুন্তী, ঐ যুবক কে, বিদুর?

আপনি তো শুনেইছেন আর্যে, ওর নাম কর্ণ। আর ওর পিতা

যে সূত অধিরথ, তা-ও তো জেনেছেন আপনি।

জিজ্ঞাসা ফুরোয় না কুন্তীর, কে ওর মাতা, বিদুর ?

এই প্রশ্নের উত্তরে একটু যেন ইতস্তত করেন বিদুর। সময় নেন কিছুটা। তারপর বলেন, অধিরথের পত্নীর নাম রাধা। রাধাই কর্ণের জননী। তবে···

থেমে যান বিদুর। উৎসুক হয়েওঠেন কুন্তী, তবে কী বিদুর ? চুপ করে আছো কেন ?

আর্যে—বিদুরের গলা প্রায়-অস্ফুট—শুনেছি, কর্ণ অধিরথ আর রাধার আপন সন্তান নয়, পালিত পুত্র। পরিত্যক্ত অবস্থায় কর্ণকে নাকি কুড়িয়ে পেয়েছিলেন তাঁরা। তখন রাধা ছিলেন নিঃসন্তান। পরে অবশ্য একাধিক পুত্রের জননী হয়েছেন তিনি।

চমকে উঠলেন কুন্তী। পরিত্যক্ত ? ঐ যুবক, রাধা-অধিরথের কুড়িয়ে-পাওয়া সন্তান ? তাঁর সেই প্রথম সন্তান, সেই পরিত্যক্ত পুত্র······না, অসম্ভব। সুদূর মথুরা থেকে ভাসতে ভাসতে সেই মঞ্জুষা যদিও কোনভাবে এসে পেঁছে থাকে অঙ্গদেশে, চম্পা নগরীতে, তাহলেও অশ্বনদী, চর্মন্বতী, যমুনা, ভাগীরথী পার হয়ে আসার সেই দীর্ঘ সময়ে জীবিত থাকা সম্ভব ছিল না সেই অসহায় শিশুর। খাদ্য বা পানীয় জোটেনি তার, নদীর স্রোতে সলিলসমাধি না ঘটলেও আয়ু ফুরিয়েছে খাদ্যের অভাবে, একফোঁটা পানীয়ের অভাবে। সে নেই। সে থাকতে পারে না। আজকের এই যুবক যে রাধা-অধিরথের কুড়িয়ে-পাওয়া সন্তান আর অর্জুনজননী কুন্তী যে কালস্রোতে ভাসিয়ে দিয়েছিলেন নিজের গর্ভজাত প্রথম সন্তানটিকে, সেটা নিতান্তই কাকতালীয় যোগাযোগ।

নিজেকে একটু সামলে নিলেন কুন্তী। এই ঘরে এখন বাতির আলো। সেই আলোয় তাঁর সামনে বিদুর। কুন্তী প্রশ্ন করলেন, অস্ত্রবিদ্যায় এত নৈপুণ্য ও অর্জন করল কিভাবে ? কে ওর শিক্ষাগুরু ?

ম্লান হাসলেন বিদুর, নৈপুণ্য অর্জন করল কিভাবে, তার

কি যথাযথ কোন উত্তর হয়, আর্যে ? যেভাবে অর্জুন আয়ত্ত করেছে তার নৈপুণ্য, সেভাবেই কর্ণও এগিয়েছে সাফল্যের পথে—সহজাত প্রতিভায়, অসম্ভব নিষ্ঠায়, নিরলস অনুশীলনে। আর শিক্ষা-গুরু ? প্রথমে ও আচার্য দ্রোণের কাছেই এসেছিল অস্ত্রশিক্ষার জন্য। শিখেও ছিল কিছুদিন, কিন্তু অর্জুনের সমকক্ষ হয়ে উঠতে পারেনি। তখন অর্জুনের সমতুল্য হওয়ার প্রত্যাশায় এক-দিন নির্জনে ও ব্রহ্মাস্ত্র চায় আচার্যের কাছে। আচার্য সম্মত হন নি। বলেছিলেন—নিত্যব্রতচারী ব্রাহ্মণ বা তপস্বী ক্ষত্রিয় ছাড়া ব্রহ্মাস্ত্র লাভ করার অধিকার আর কারও নেই।

তারপর ? কুন্তী উদগ্রীব।

দ্রোণের কাছে প্রত্যাখ্যাত হয়ে কর্ণ চলে যায় মহেন্দ্র পর্বতে, আচার্য পরশুরামের কাছে। তাঁর কাছে বহুদিন ছিল ও। পরশু-রামই ওকে সুশিক্ষিত করে তুলেছিলেন অস্ত্রবিদ্যায়। তাঁর কাছ থেকে ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগবিধিও শিখে এসেছে সে। তবে পরশু-রামের কাছে নিজের সঠিক পরিচয় দেয় নি কর্ণ। সেখানে নিজেকে ও ভৃগুকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ বলে পরিচিত করেছিল। মনের মতো শিষ্য পেয়ে নিজের সবটুকু বিদ্যা উজাড় করে দিয়েছিলেন পরশু-রাম। আর সেইসঙ্গেই সে লাভ করেছে এক দুর্ভেদ্য বর্ম, যে বর্ম ভেদ করে কোন অস্ত্রের পক্ষেই তার অঙ্গে আঘাত করা সম্ভব নয়। তাই কর্ণ আজ অতুলনীয় ধনুর্ধর, অর্জুনের সমকক্ষ।

পরশুরামের নাম শুনেই শিহরিতা হয়েছিলেন কুন্তী। বিদুরের শেষ কথাটায় বিষণ্ণ হাসি ফুটল তাঁর ওষ্ঠপ্রান্তে, শুধুই সমকক্ষ, বিদুর ?

চোখ নামিয়ে নিলেন বিদুর, এ বড় কঠিন প্রশ্ন, আর্যে। আপনি আমাকে বিব্রত করবেন না।

অনেকক্ষণ কথাহীন বসে রইলেন কুন্তী। তারপর ধীরে ধীরে বললেন, ওর গতিবিধির ওপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখো, বিদুর। আর ওর অতীত সম্বন্ধে আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করা যায় কি না,

চেষ্টা কোরো।

গভীর দৃষ্টিতে একবার কুন্তীর দিকে তাকালেন বিদুর। ছড়িয়ে পড়ল নীলাভ আলোটুকু। তারপর অভিবাদন জানিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন কক্ষ থেকে।

দুহাতে মুখ ঢেকে শয্যায় আছড়ে পড়লেন কুন্তী।

৭

বারণাবত। মন্ত্রীদের মুখে বারবার বারণাবত নগরের প্রশংসা শুনতে শুনতে জায়গাটা দেখার কৌতূহল জেগে উঠেছিল পাণ্ডবদের মধ্যে। ধৃতরাষ্ট্র অমত করেন নি। জননী কুন্তী আর চার অনুজকে নিয়ে বারণাবতে এসেছেন যুবরাজ যুধিষ্ঠির।

হ্যাঁ, যুধিষ্ঠির এখন হস্তিনাপুরের যুবরাজ। স্বীকৃত হয়েছে তাঁর অধিকার। ধৃতরাষ্ট্রপুত্র দুর্যোধন নয়, পাণ্ডুতনয় যুধিষ্ঠিরই চিহ্নিত হয়েছেন হস্তিনাপুরের ভাবী নৃপতি হিসেবে। বহুবছর ধরে যে স্বপ্নের মধ্যে কুন্তীর বসবাস, তা আর এক পা এগিয়েছে বাস্তবের দিকে। দুর্যোধন কি পেরেছে মেনে নিতে? বোধহয় না। মানতে পারা স্বাভাবিক নয়। জন্মের পর থেকেই যে জেনে এসেছে এ রাজ্যের রাজপদ তারই, আজ হঠাৎ তা হারিয়ে বসলে কী করেই বা মেনে নিতে পারে সে?

বারণাবতে আসার আগে একান্তে যুধিষ্ঠিরকে কিছু নির্দেশ দিয়েছেন বিদুর। বলেছেন—ওখানে এক জতুগৃহ তৈরী করা আছে, পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হবে তোমাদের, সাবধানে থাকবে, চিনে রাখবে পথঘাট।

ফাল্গুন মাসে বারণাবত নগরে এসে পৌঁছেছেন পঞ্চপাণ্ডব আর জননী কুন্তী। প্রজারা এসেছে যুবরাজদর্শনে।

সুন্দর, বড় সুন্দর এই বারণাবত। ভাল লাগে। থেকে যেতে ইচ্ছে করে। নগরীর ব্রাহ্মণ, নগরাধিকারী, রথী, বৈশ্য আর শূদ্রদের অনেকের ঘরেই গেলেন যুধিষ্ঠির। রাজনীতি শিখেছেন

তিনি। বুঝেছেন, সবার সঙ্গে সম্পর্ক ভাল রাখতে না পারলে রাজপদে টিকে থাকা যায় না। তাছাড়া, মাথার ওপর এখন ঝুলছে বিপদের শাণিত তরবারি। এ-সময় বারণাবতবাসীদের সঙ্গে সুসম্পর্ক গড়ে তোলা একান্তই জরুরী।

চমৎকার একটি প্রাসাদ নির্দিষ্ট হয়েছে পাণ্ডবদের জন্য। তাঁদের দেখাশোনার দায়িত্ব পুরোচনের। সবকিছু নিপুণ হাতে সাজিয়ে রেখেছে পুরোচন। লোভনীয় খাদ্য, পানীয়, আসন, শয্যা। অভাব নেই কিছুরই। তবু মনের মধ্যে অস্বস্তি। সর্বনাশের কুট কামড়।

একাদশ দিনে যুধিষ্ঠিরের সামনে এসে দাঁড়াল পুরোচন, আমার একটি নিবেদন আছে, যুবরাজ।

নির্ভয়ে বলো, পুরোচন।

যুবরাজ, আপনাদের বসবাসের জন্য এর থেকেও সুন্দর একটি গৃহ প্রস্তুত করেছি আমি। ঐ গৃহের নাম শিব। আমার একান্ত ইচ্ছা জননী কুন্তী সহ আপনারা ঐ গৃহে গিয়ে বসবাস করুন।

স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ পুরোচনের দিকে তাকিয়ে রইলেন যুধিষ্ঠির। আসন্ন বিপর্যয়ের দুন্দুভি শুনতে পাচ্ছেন তিনি, ভেসে আসছে বিদায়বেলায় উচ্চারিত পিতৃব্য বিদুরের সেই সতর্ক বাণী। সূক্ষ্ম হাসির রেখা দেখা দিল যুধিষ্ঠিরের ওষ্ঠপ্রান্তে, উত্তম, তাই হবে। তুমি যাত্রার আয়োজন করো, পুরোচন।

কৃতার্থ হলাম যুবরাজ। আমার অনেক যত্নে গড়া শিব-গৃহ আজ ধন্য হবে আপনাদের পদার্পণে।

চলে গেল পুরোচন।

শিব-গৃহে প্রবেশ করলেন পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তী। অনেক যত্নে গড়া, তাতে কোন সন্দেহ নেই। নিখুঁত, পরিপাটি ব্যবস্থা। কৃতার্থ পুরোচন বলল, আপনারা এখন বিশ্রাম করুন, যুবরাজ। আমি পরে আসব।

পুরোচন বিদায় নেওয়ার পর গৃহের প্রতিটি কক্ষ তন্নতন্ন করে

পরীক্ষা করলেন যুধিষ্ঠির। পরীক্ষা করতে করতে বিচিত্র হাসি ফুটল তাঁর ঠোঁটে। ভীমকে সম্বোধন করে বললেন, ভ্রাতঃ, এই গৃহ ঘৃত, চর্বি আর গালা দিয়ে নির্মিত। শণ, সর্জরস, শর, তৃণ, বংশ প্রভৃতিকে ঘৃতাক্ত করে এই গৃহ নির্মাণ করেছে সুদক্ষ বাস্তু-কাররা। আজ বুঝতে পারছি পিতৃব্য বিদুর সঠিক সংবাদই দিয়েছিলেন। আমাদের জীবন্ত দগ্ধ করাই দুর্যোধনের উদ্দেশ্য।

ভীমসেন অধীর, তাহলে এ গৃহে বাস করার প্রয়োজনই বা কী? আমরা তো অনায়াসেই ফিরে যেতে পারি আগের গৃহটিতে।

মধ্যম ভ্রাতাটির সরল সমাধান শুনে বেশ উচ্চকণ্ঠেই হেসে উঠলেন যুধিষ্ঠির। ভীমসেনের জগতে সবকিছুই প্রায় এক-মাত্রিক। হ্যাঁ অথবা না।

যুধিষ্ঠির বললেন, না ভীমসেন, তা হয় না। এই গৃহেই বাস করব আমরা। অপেক্ষা করো, ভবিষ্যৎ আমাদের জন্য অন্য কিছু নিয়ে প্রতীক্ষা করছে।

অগ্রজের দুর্বোধ্য উক্তির বিন্দুবিসর্গও বুঝলেন না ভীমসেন। তাঁর বিস্মিত মুখের দিকে তাকিয়ে গভীর স্বরে যুধিষ্ঠির বললেন, বুঝলে না, ভ্রাতঃ? একটু ভাবার চেষ্টা করো। এই জতুগৃহ আগুনে ভস্মীভূত হয়ে গেলে পিতামহ ভীষ্ম এবং অন্যান্যরা অবশ্যই প্রশ্ন তুলবেন—এমন গর্হিত অপরাধের জন্য দায়ী কে? সন্দেহের তীরটা নিক্ষিপ্ত হবে দুর্যোধনের দিকেই। কিন্তু আমরা এখান থেকে ভীত হয়ে ফিরে গেলে দুর্যোধন কোন-না কোন উপায়ে আমাদের সংহার করবেই। তার হাতে অনেক ক্ষমতা, অনেক অর্থবল। কাজেই, এ সুযোগটা আমরা হাতছাড়া করতে পারি না, ভীমসেন।

ব্যাপারটা অনেকটা স্বচ্ছ হয়ে আসে ভীমসেনের সামনে। হ্যাঁ, রাজনৈতিক বিচারে লাভের আশা আছে এ পথে। সত্যিই তীক্ষ্ণধী অগ্রজ যুধিষ্ঠির। কিন্তু রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটটা বুঝলেও মূল প্রশ্নের ধোঁয়াশাটা কাটে না ভীমসেনের। বিমূঢ়ের মতো তিনি প্রশ্ন

করেন, কিন্তু জতুগৃহের আগুনে দগ্ধ হয়েআমরা যদি মারাই যাই, তাহলে আর অন্যান্য প্রশ্নগুলোর তো কোন অবকাশই থাকে না।

যুধিষ্ঠিরের চোখ জুড়ে ঘনিয়ে এল সুদূরের ছায়া, অপেক্ষা করো, ভ্রাতঃ। জতুগৃহের আগুনে দগ্ধ হওয়া আমাদের ললাট-লিখন নয়।

জননী কুন্তীর সঙ্গে একান্তে বসে ভবিষ্যতের কোন জটিল আলোচনায় ব্যস্ত ছিলেন পঞ্চপাণ্ডব। ঠিক এমনি সময় দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াল একটি কৃষ্ণবর্ণ মানুষ। বলল, প্রণাম।

মুহূর্তে উঠে দাঁড়ালেন ভীমসেন, কে আপনি?

কৃষ্ণবর্ণ মানুষটি বিচলিত হল না এতটুকুও, মহামন্ত্রী বিদুর আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি একজন খনক।

বিদুর? বিদুর পাঠিয়েছে? কুন্তীর বুকেপ্রকাশহীন উচ্ছ্বাস, কী সংবাদ পাঠিয়েছেন মহামন্ত্রী?

আর্যে, মহাত্মা বিদুর জানিয়েছেন, আগামী কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশীর রাতে এই গৃহে অগ্নিসংযোগ করবে পুরোচন।

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, আপনার কথা যে সত্য, তার কোন প্রমাণ আছে?

আছে যুবরাজ—বলতে বলতে যুধিষ্ঠিরের দিকে তাকাল খনক—মহামন্ত্রী আমাকে বলতে বলেছেন যে এখানে আসার আগে একান্তে তিনি কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন আপনাকে। বলেছিলেন ওখানে এক জতুগৃহ তৈরী করা আছে, পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হবে তোমাদের, সাবধানে থাকবে, চিনে রাখবে পথঘাট। মহামন্ত্রী বলেছেন, আমার মুখে এই কথাগুলো শুনলেই আপনি বিশ্বাস করতে পারবেন আমাকে।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন যুধিষ্ঠির। হ্যাঁ, এই খনক যে পিতৃব্যপ্রেরিত, তাতে আর কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চিন্তমনে প্রশ্ন করলেন যুধিষ্ঠির, কিন্তু আমাদের পরিত্রাণের কোন উপায়

কি জানিয়েছেন পিতৃব্য ?

জানিয়েছেন যুবরাজ। আর সেজন্যই আর কারুকে না পাঠিয়ে তিনি আমাকেই পাঠিয়েছেন। আমি তো আগেই বলেছি যুবরাজ, আমি একজন খনক। খনন করাই আমার কাজ। নিশ্চিন্ত থাকুন, জতুগৃহের আগুন আপনাদের স্পর্শ করতে পারবে না।

সত্যিই অবাক হলেন যুধিষ্ঠির। এই খনক কি জাদু জানে ? একান্ত গোপনে জতুগৃহের নীচে এক গভীর সুড়ঙ্গ খুঁড়ে দিয়েছে সে। সুড়ঙ্গের মুখ এমনভাবে আচ্ছাদিত যে ওপর থেকে তা বোঝার কিছুমাত্র উপায় নেই। ঐ সুড়ঙ্গপথে যে-কোন মুহূর্তে অনায়াসে পলায়ন করতে পারবে পাণ্ডবরা। পুরোচন জানতে পারে নি কিছুই। জতুগৃহের প্রবেশদ্বারে সারাক্ষণ সতর্ক দৃষ্টি রাখে সে, কিন্তু ভেতরে কী চলছে, তা জানার কোন সুযোগই সে পায় নি। খনকটি সত্যিই দক্ষ।

দিনের বেলা বনে বনে মৃগয়া করে বেড়ায় পাঁচ ভ্রাতা। পুরোচন নিশ্চিন্ত থাকে। রাত নামলে কক্ষের মধ্যে পালা করে জাগে পাণ্ডবরা। প্রস্তুত থাকে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে। শুধু রাতের পর রাত না-ঘুম কেটে যায় কুন্তীর। তাঁর সন্তানরা, তাঁর অনেক সাধের সন্তানরা, তাদের যেন স্পর্শ না করে কোন বিপদ।

সকাল। আলো। চার ভ্রাতা এবং জননী কুন্তীর সামনে বসে যুধিষ্ঠির বললেন, লগ্ন এসে গেছে। আজ রাত্রেই এই গৃহে অগ্নিসংযোগ করে সুড়ঙ্গপথে পলায়ন করব আমরা। তোমরা প্রস্তুত থেকো।

অগ্রজের কথা শুনে কঠিন একটা প্রশ্ন তুললেন কনিষ্ঠ সহদেব, কিন্তু এই গৃহ ভস্মসাৎ হওয়ার পর সেই ধ্বংসাবশেষের মধ্যে আমাদের ছয় জনের দগ্ধ মৃতদেহ তো খুঁজে পাবে না কেউ। তাহলে আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে কী করে ?

সঙ্গত প্রশ্ন। অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন। চার ভ্রাতা এবং জননী

কুন্তী জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকালেন যুধিষ্ঠিরের দিকে, যেন যাবতীয় জটিলতার উত্তর সঞ্চিত আছে ঐ মানুষটির জ্ঞানভাণ্ডারে।

যুধিষ্ঠির গম্ভীর, এ প্রশ্ন আমাকেও ভাবিয়েছে, সহদেব। সমাধানও পেয়েছি, কিন্তু সে কোন সহজ সমাধান নয়। এক্ষেত্রে, ভবিষ্যতের স্বার্থে, নিজেদের স্বার্থে, কিছুটা নির্মম হতেই হবে আমাদের। আর সে দায়িত্ব—বলতে বলতে কুন্তীর দিকে চোখ ফেরালেন যুধিষ্ঠির—সে দায়িত্ব আপনাকেই পালন করতে হবে, মাতা।

কেঁপে উঠলেন কুন্তী। কোন্ নির্মম দায়িত্ব পালনের ভার তাঁর ওপর দিতে চায় যুধিষ্ঠির?

যুধিষ্ঠির বললেন, আজ রাত্রে এই গৃহে দানধ্যান উপলক্ষ্যে নিমন্ত্রণ জানাতে হবে ব্রাহ্মণদের। শুধু পুরুষদের নয়, নিমন্ত্রণ জানাতে হবে স্ত্রীলোকদেরও। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য বর্ণের স্ত্রী-পুরুষদের জন্যও থাকবে অবারিত দ্বার। ভূরিভোজে আপ্যায়িত করতে হবে সকলকে। আর সেইসঙ্গে থাকবে যথেচ্ছ সুরাপানের আয়োজন। যে-কোন পাঁচজন পুরুষ আর একজন স্ত্রীলোককে অপরিমিত পানভোজনে সংজ্ঞাহীন করে এই জতুগৃহে অগ্নিসংযোগ করব আমরা। আমাদের পলায়নের পর ঐ ছয়টি মৃতদেহকে আমাদেরই মৃতদেহ বলে বিশ্বাস করবে সকলে। এখন আজ রাত্রে এই দানধ্যানের ব্যাপারে আপনাকেই উদ্যোগী হতে হবে, মাতা।

অকস্মাৎ প্রবল ভূমিকম্পে দুলে ওঠে সমগ্র চরাচর, মহানিশা ছেয়ে যায় দুই চোখে। জন্মদাত্রী বসুন্ধরা কি অবগুণ্ঠনে মুখ ঢাকেন অমেয় লজ্জায়? কেঁপে ওঠে বাসুকির ফণা? তাই কি ভুঁইদোল? ভূমিকম্প? কোথাও কি ভূমিকম্প এখন? না, সবই তো স্থির, অনড়, সর্বংসহা! তাহলে নিজেরই নিগূঢ় প্রদেশে? বুকের কোটরে, প্রতিটি পাঁজরে?

সংজ্ঞাহারার মতো কিছুক্ষণ নিথর বসে থাকেন কুন্তী। তারপর ধীরে ধীরে অবচেতনার শাশ্বত স্তর ভেদ করে জেগে ওঠে

সেই বহুদিন-লালিত স্বপ্ন ঃ পুত্ররা অধিষ্ঠিত হবে স্বমহিমায়, মর্যাদায়, রাজসিংহাসনে বৃত হবে জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির। দুর্মর, অপ্রতিরোধ্য সেই স্বপ্নের জাগরণ কুন্তীর আয়ত নয়নে। উঠে দাঁড়ালেন তিনি। বললেন, সে আয়োজন আমি করব। তোমরা প্রস্তুত থাকো।

সন্ধ্যার আগে থেকেই শিব-গৃহে শুরু হল লোক সমাগম। অগুনতি লোক। স্বয়ং কুন্তী আহ্বান জানিয়েছেন, বারণাবত-বাসীরা কি পারে না এসে! মুক্তহস্তে দান করবেন যুধিষ্ঠির-জননী। এসেছেন লুব্ধ ব্রাহ্মণের দল। আয়োজন করা হয়েছে অপরিমিত পানভোজনের। বর্ণ নির্বিশেষে বুভুক্ষু মানুষ সমবেত হয়েছে শিব-গৃহে। আজ বড় সুখের দিন বুভুক্ষুদের!

সন্দেহ করার কোন কারণ ঘটে নি পুরোচনের। দানধ্যান করা বা মানুষকে ভোজনে আপ্যায়িত করে পুণ্যসঞ্চয়ের আকাঙ্ক্ষা জাগতেই পারে কুন্তীর মধ্যে। এতে সন্দেহ করার কী আছে! রাজারাজড়াদের গৃহে এমন অনুষ্ঠান তো প্রায়শঃই ঘটে থাকে।

নিশ্চিন্তই আছে পুরোচন। কিন্তু নিশ্চিন্ত নেই কুন্তী। ছয়টি মানুষ তাঁর চাই ঃ পাঁচজন পুরুষ, একজন নারী। জতুগৃহের ধ্বংসাবশেষে রেখে যেতে হবে নিজেদের বিকল্প। কুন্তীর সন্ধানী দৃষ্টি ঘুরে বেড়াচ্ছে সর্বত্র। নজর রাখছেন পঞ্চপাণ্ডবও।

রাত ক্রমে ঘন হয়ে এল। পরিতুষ্ট বিপ্রের দল দান গ্রহণ করে প্রস্থান করল অজস্র আশীর্বচন উচ্চারণ করতে করতে। একে একে বিদায় নিল অন্যান্য আমন্ত্রিতরাও। প্রায়-জনহীন হয়ে গেল জতুগৃহ।

আর এগিয়ে এল সেই লগ্ন। কারণ যার অথবা যাদের জন্য এত আয়োজন, তারা যে ধরা দিয়েছে স্বেচ্ছায়, একরাশ কৃতজ্ঞতায়ঃ এক নিষাদী আর তার পাঁচ পুত্র। স্বয়ং মৃত্যুই যেন হতভাগ্যদের পাঠিয়ে দিয়েছে এই জতুগৃহে। বহুমূল্য খাদ্যের ডালি উজাড়

করে দিয়েছেন কুন্তী। অনাহারী মানুষগুলো আহার করেছে পরম তৃপ্তিতে। তাদের সকৃতজ্ঞ চাহনি বারবার শিহরিত করেছে পাণ্ডব-জননীকে। ওরা জানে না জীবনের শেষ খাদ্যটুকুতে আজ তৃপ্ত হচ্ছে জ্বলন্ত জঠর, জানে না করুণাময়ী পাণ্ডবজননীর মস্তিষ্কে ছুটে বেড়াচ্ছে ওদের জীবন্ত দগ্ধ করার অসহায় বাসনা।

আহারের পর পানীয়। অর্থাৎ সুরা। নিষাদ পুরুষ-রমণীর দৈনন্দিন জীবনযাপনে সুরাপান অতি সাধারণ ঘটনা। কিন্তু আজকের এই সুরা সাধারণ সুরা নয়, রাজপরিবারের বহুমূল্য সুরা। ভোজনতৃপ্ত পাঁচটি পুরুষ আর তাদের জন্মদাত্রী অনন্ত তৃষ্ণায় পান করেছে সেই সুরা। পাত্র নিঃশেষিত হতেই পাণ্ডবরা ভরে দিয়েছেন শূন্য পাত্র। আরও সুরা, আরও সুরা। পূর্ণ-উদর সুখাদ্য আর আকণ্ঠ সুরার নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে একসময় উঠে দাঁড়ানোর শক্তিটুকুও হারিয়ে ফেলেছে হতভাগ্যরা। পরিকল্পনা সার্থক হয়েছে। পাঁচ পাণ্ডব আর জননী কুন্তীর বিকল্প হিসেবে জতুগৃহের প্রাঙ্গনে শরীর বিছিয়ে দিয়েছে পাঁচ নিষাদ আর তাদের জন্মদাত্রী।

তখন গভীর রাত। নিশ্চিন্ত পুরোচন গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। বাতাস বইছে বেশ জোরেই। যুধিষ্ঠির বললেন, ভীমসেন, আর অপেক্ষা নয়। তুমি অগ্নিসংযোগ করো। আমরা প্রবেশ করি সুড়ঙ্গপথে।

তৎক্ষণাৎ এগোতে যাচ্ছিলেন ভীমসেন। বাধা দিলেন কুন্তী, একটু দাঁড়াও ভীমসেন।

ধীর পায়ে কুন্তী এগিয়ে গেলেন প্রাঙ্গনের দিকে। পরম তৃপ্তিতে, চেতনাহরা নেশায় আচ্ছন্ন হয়ে লুটিয়ে রয়েছে ছয়জন মানুষ। স্থির দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাদের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন কুন্তী। দু চোখ বেয়ে গড়িয়ে পড়ল হীরেদানার মতো টলটলে একরাশ অশ্রুবিন্দু। আর একটু এগোলেন কুন্তী। গিয়ে দাঁড়ালেন মানুষগুলির একেবারে সামনে। নীচু হলেন, আরও,

আরও নীচু। তারপর—যে দৃশ্য কখনও দেখে নি কেউ, সেই দৃশ্যের প্রত্যক্ষদর্শী হল পাঁচ স্তম্ভিত পান্ডব—নতজানু হয়ে ছয়টি মানব-মানবীকে প্রণাম জানালেন কুন্তী!

যুধিষ্ঠির নির্বাক। বাকি চার ভ্রাতা বিমূঢ়। এগিয়ে এলেন কুন্তী। বললেন, শেষ শ্রদ্ধাটুকু জানিয়ে এলাম। চলো বৎস, সময় হল।

কুন্তীকে নিয়ে সুড়ঙ্গপথে প্রবেশ করলেন চার পান্ডব। পুরোচনের কক্ষে, জতুগৃহের দ্বারে আর চারপাশে অগ্নিসংযোগ করে দ্রুত সুড়ঙ্গে এসে পৌঁছলেন ভীমসেন। জ্বলে উঠল জতুগৃহ, জ্বলতে লাগল, পুড়তে লাগল। দগ্ধ হল পুরোচন, প্রাণ দিল ছয়জন নিরপরাধ মানব-মানবী।

ভাগীরথীর তীরে অপেক্ষা করছিল মানুষটি। জননীসহ পঞ্চপান্ডবকে নদীর দিকে আসতে দেখে এগিয়ে গেল সে। এই অন্ধকারে সহসা একটি মানুষকে দেখে চমকে উঠলেন পান্ডবরা। অন্ধকারে হাসল মানুষটি। বলল, ওখানে এক জতুগৃহ তৈরি করা আছে, পুড়িয়ে মারার চেষ্টা করা হবে তোমাদের, সাবধানে থাকবে, চিনে রাখবে পথঘাট।

কথাগুলো বিস্মৃত হওয়ার কোন কারণ নেই। সেই খনকও এসে দাঁড়িয়ে উচ্চারণ করেছিল ঠিক এই কথাগুলোই। বিদুরের সংকেতবাক্য।

তবু যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, কে পাঠিয়েছেন তোমাকে?

মহামন্ত্রী বিদুর। নৌকা প্রস্তুত। আপনাদের ভাগীরথীর অপর পারে পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আমাকেই দিয়েছেন মহামন্ত্রী। আসুন।

সঠিক সময়ে, সঠিক জায়গায়—বিদুর সর্বত্র উপস্থিত। কুন্তী জানেন, কোথায় এর উৎস। এক নারীকে অণুক্ষণ নিঃশব্দে ঘিরে রাখাই বোধহয় বিদুরের জীবনসাধনা।

নৌকাযোগে ভাগীরথীর অপর পারে পেঁছে গেলেন পাণ্ডবরা। ফিরে গেল বিদুরপ্রেরিত মানুষটি। কুন্তী এবং পঞ্চপাণ্ডবের জীবনে আবার শুরু হল এক বনচর অধ্যায়।

জতুগৃহের আগুনে দগ্ধ সাতটি মৃতদেহের দগ্ধাবশেষ আবিষ্কার করল বারণাবতবাসীরা। হস্তিনাপুরে সংবাদ গেল: পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তী জীবন্ত দগ্ধ হয়েছেন জতুগৃহের আগুনে, সেই সঙ্গেই দগ্ধ হয়েছে পুরোচনও। না, সেই গোপন সুড়ঙ্গ কারুর চোখে পড়ে নি। ঠিক সময়ে সুদক্ষ খনক সে সুড়ঙ্গ বুজিয়ে দিয়েছিল নিপুণ হাতে।

ধৃতরাষ্ট্রের নির্দেশে সাড়ম্বরে সম্পন্ন হল পঞ্চপাণ্ডব আর কুন্তীর শ্রাদ্ধক্রিয়া। শোকের ছায়া ঘনাল হস্তিনানগরে। শুধু একটি মানুষকে স্পর্শ করল না সেই শোক। তিনি বিদুর।

এখনই ফিরিয়ে আনা যেত পাণ্ডবদের। কিন্তু না। রাজনৈতিক স্বার্থ তা বলে না। বনচর জীবনের পথে ঘুরতে ঘুরতে, পৃথিবীর পাঠশালায় দাঁড়িয়ে, কিছু মিত্র সংগ্রহ করুক পাণ্ডবরা, সঞ্চয় করুক কিছু অমূল্য শিক্ষা।

নির্বাক বিদুর নিঃশব্দে দেখলেন পাণ্ডবদের শ্রাদ্ধক্রিয়া।

যুধিষ্ঠিরের শূন্যস্থান পূর্ণ করতে, যুবরাজ পদে অভিষিক্ত হল দুর্যোধন।

৮

জীবন মানুষকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে যায়! এক যাত্রাবিন্দু থেকে অন্য এক অজানা বিন্দুতে, কোন অচেনা গন্তব্যে। কন্যা পরিণত হয় প্রিয়ায়, জায়ায়, জায়া রূপান্তরিতা হয় জননীতে, জননী একদিন হয়ে ওঠে মাতামহী অথবা পিতামহী। কালচক্র নিরন্তর চলমান।

বনচর জীবনে প্রথম পৌত্র জন্মানোর সংবাদ পেলেন কুন্তী।

জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির নন, সন্তানদের মধ্যে রমণীসঙ্গে প্রথম স্নাত হলেন মধ্যম ভীমসেন। এক অরণ্যচর কৃষ্ণবর্ণা কন্যা, নাম তার হিড়িম্বা, ভীমসেনকে বরণ করল জীবনে। হিড়িম্বার অগ্রজ হিড়িম্ব মেনে নিতে পারে নি সহোদরার প্রণয়। বহিরাগত ভীমসেনকে সে আহ্বান জানিয়েছিল দ্বন্দ্বযুদ্ধে। হিড়িম্ব সাহসী, শক্তিমান। কিন্তু ভীমসেন শুধু শক্তিমানই নন, রণনিপুণ আচার্যের কাছে শিক্ষাপ্রাপ্ত তিনি। যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল অরণ্যচর হিড়িম্ব, নিহত হয়েছিল ভীমসেনের হাতে। অগ্রজের জীবনের মূল্যে সার্থক হয়েছিল কালো মেয়ে হিড়িম্বার প্রেম। ভীমসেনকে নিয়ে সে চলে গিয়েছিল নির্জনবাসে, কারণ এ রীতিই প্রচলিত তাদের সমাজে।

প্রায় এক বছর পর ফিরে এসেছেনভীমসেন। কুন্তী শুনেছেন অরণ্যের আশ্রয়ে হিড়িম্বা জন্ম দিয়েছে এক পুত্র সন্তানের। সে পুত্রেরনাম রাখাহয়েছে ঘটোৎকচ। শূরসেন-কন্যা পৃথা আজপিতা-মহী কুন্তী। খুশি হয়েছেন কুন্তী। খুশি, আশা। খুশি আর আশা আর নতুনতর অস্তিত্বের চেতনা। নতুন জীবনের পথে প্রথম এগিয়েছেন ভীমসেন। এবার অন্যরা : যুধিষ্ঠির, অর্জুন, নকুল, সহদেব। নারী। প্রাণপ্রিয় পুত্রদের জীবনে নারীর ছায়াপাত। ভাবতে গিয়ে সহসা মাথার মধ্যে কোন তীক্ষ্ম কাঁটার উপস্থিতি অনুভব করেন কুন্তী। কৈশোর থেকে যৌবনের প্রবালরঙা দিন-গুলোতে তাঁর শরীরের অভ্যন্তরে দাগ রেখে গেছে পাঁচ-পাঁচটি পুরুষ : দুর্বাসা, পাণ্ডু, ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র। কাঁটাটা নড়েচড়ে, যন্ত্রণা দেয়। আশ্চর্য, এতদিন কোথায় ছিল এই কাঁটা, এই অস্বস্তিকর মনখোঁচানো ব্যথা ? নাকি জ্বালা ?

আর একজন, জীবনের ষষ্ঠ পুরুষটি, একমাত্র সান্ত্বনা, এই বেদনার বাইরে আজও স্নিগ্ধছায়া। বিদুর কোনদিন আসে নি এই শরীরে। সে আমার অনেক দূরের, সে আমার ভীষণ কাছের।

পাঁচ পুত্রকে নিয়ে বনপথে সদ্য-পিতামহী কুন্তী। আর

এমনি সময়েই একদিন সামনে এসে দাঁড়ালেন এক প্রাজ্ঞ বৃদ্ধ, কুরুবংশ যাঁর কাছে অশেষ ঋণে ঋণী : কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

প্রণাম করলেন পঞ্চপাণ্ডব। প্রণাম করলেন কুন্তী। দূরদ্রষ্টা ব্যাসদেবের চোখে বিষণ্নতার জমাট ছায়া, বৎসগণ, বিদুরের কাছে আমি সবই শুনেছি। নিয়তির এক নিষ্ঠুর ক্রীড়ার ক্রীড়নক হয়েছ তোমরা। তবে দুশ্চিন্তা কোরো না, নিশ্চিত থাকো, সুদিন আসছে। ভবিষ্যৎ একদিন তোমাদের সামনে সাজিয়ে দেবে সুখের ডালি।

কুন্তীর মুখে উদ্ভাসিত হাজার সূর্যের কিরণ, আমরা এখন কী করব বলে দিন।

ব্যাসদেব বললেন, আপাতত তোমরা আমার সঙ্গেই যাবে। আমার পরিচিত একটি আশ্রয়ে তোমাদের রেখে যাব আমি।

আবার চলা। জংলা হাওয়ায় সত্তা ডুবিয়ে অফুরান পথচলা। সঙ্গী ব্যাসদেব।

একচক্রা নগরী। পুত্রবধূ এবং পাঁচপৌত্রকেনিয়ে ব্যাসদেব গিয়ে উঠলেন এক ব্রাহ্মণের গৃহে। ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর এক পুত্র, এক কন্যা। ব্যাসদেব ব্রাহ্মণকে বললেন, এই ছয়জন আমার একান্ত পরিচিত। কিছু বিশেষ কারণে আপাতত আমি এদের তোমার আশ্রয়েই রেখে যাচ্ছি। এদের অন্নসংস্থানের জন্য তোমাকে চিন্তিত হতে হবে না। ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করেই নিজেদের ভরণপোষণ করবে এরা। তোমার আপত্তি নেই তো?

ব্রাহ্মণ করজোড়ে বললেন, হে জ্ঞানীশ্রেষ্ঠ, আপনার যে-কোন আদেশই আমার কাছে বেদবাক্যসম।

যুধিষ্ঠিরকে একান্তে ডাকলেন ব্যাসদেব। বললেন, বৎস, এ আশ্রয় তোমাদের চিরদিনের জন্য নয়। এক মাসের মধ্যেই আমার কাছ থেকে নতুনতর সংবাদ পাবে তোমরা। ততদিন ধৈর্য ধরে থেকো, ভেঙে পোড়ো না। আর অর্জুনকে বোলো, তার ধনুর্বিদ্যার অনুশীলন যেন অব্যাহত থাকে। তোমাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যতের

জন্য এক অতীব গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে তাকে।

চলে গেলেন ব্যাসদেব। ব্যাকুলা কুন্তী চরম ব্যথায় লক্ষ্য করলেন—তাঁর রাজকুমার পুত্ররা এতদিনে পরিণত হয়েছে ভিক্ষা-জীবীতে! প্রতিদিন ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য একচক্রা নগরীর পথে পথে ঘোরে চার পাণ্ডব। দিনান্তে জননীর সামনে এনে রাখে ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী। চোখের জল বুকের গভীরে লুকিয়ে অনাহারী সন্তানদের খাদ্য প্রস্তুত করেন জননী কুন্তী। শিক্ষা? হা ঈশ্বর, শিক্ষাদানের এ কেমন হৃদয়হীন পদ্ধতি তোমার? এত মূল্য দিয়ে, এত অপরিমেয় দীনতার বিনিময়ে তোমার পাঠশালা থেকে তুলে আনতে হয় এক একটি শিক্ষার বীজ? কেন এত নিষ্ঠুর তুমি, হে নিরুত্তর পাথুরে প্রাচীর, কেন? কেন তোমার পারাপারহীন ক্রীড়াঙ্গনে কোন কিছুই সহজলভ্য নয়, কেন সব হারিয়ে কিছু পাওয়ার অনন্ত চক্রাবর্ত? হে নির্বাক, হে নির্লিপ্ত, নিরুচ্চার, হে অনন্ত মহাকাল, তোমার অসীম অন্তরে আমার জন্য কোথাও কি সঞ্চিত নেই এতটুকু করুণা? আর কবে, আর কত রিক্ততার দুঃসহ প্রহর অতিক্রম করে, বলো, বলো হে অনন্ত মহাকাল, অজ্ঞাত নিয়তি আমার, কবে পাবো তোমার সে করুণার পরশ, স্নিগ্ধ হবো কতদিনে?

ভিক্ষার জন্য একচক্রার পথে পথে ঘুরে বেড়ায় চার ভ্রাতা। শুধু একজন জনান্তিকে ব্যস্ত থাকে নিবিড় অনুশীলনে। অর্জুনকে ভিক্ষায় বেরোনোর অনুমতি দেন নি যুধিষ্ঠির। আপত্তি করে-ছিলেন অর্জুন। যুধিষ্ঠির শোনেন নি। ব্যাসদেবের বিদায়বেলার নির্দেশ অনির্বাণ জেগে আছে তাঁর চেতনায়ঃ ধনুর্বিদ্যার অনু-শীলন যেন অব্যাহত থাকে অর্জুনের, তোমাদের প্রত্যেকের ভবিষ্যতের জন্য এক অতীব গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে তাকে। কী সেই গুরুদায়িত্ব, জানেন না যুধিষ্ঠির। শুধু জানেন, ঐ প্রজ্ঞাবান দূরদর্শী মানুষটির নির্দেশ অলঙ্ঘ্যনীয়। অর্জুন তাই ভিক্ষার সঙ্গী নন। ধনুর্বিদ্যার কঠিনতম অনুশীলনে তিনি ডুবে

থাকেন প্রতিদিন, লোকচক্ষুর আড়ালে।

কয়েকদিনের মধ্যেই আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণ আর সমগ্র একচক্রা-বাসীর ঋণ শোধ করল পাণ্ডবরা। একচক্রার প্রকৃত অধিপতি এক দুর্বল রাজা। কিছু দূরে বেত্রকীয়গৃহ নামক একটি স্থানে বসবাস করেন তিনি। তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে কার্যত একচক্রার অধিপতি হয়ে বসেছে বক নামক এক দুর্দান্ত ব্যক্তি। অমিত শক্তিশালী এই বক নরমাংসভোজী। একচক্রার প্রতিটি পরিবার থেকে পালা করে প্রতিদিন তার কাছে পাঠাতে হয় এক শকটপূর্ণ তণ্ডুল, দুটি মহিষ এবং একজন করে মানুষ। বেত্রকীয়গৃহবাসী রাজা সব জেনেও উদাসীন, কারণ বককে প্রতিহত করার শক্তি তাঁর নেই। একচক্রার কোন কোন মানুষ কখনও কখনও প্রতিবাদ করেছে এ অত্যাচারের। উত্তরে সেইসব মানুষদের পরিবারের প্রতিটি সদস্যকে হত্যা করেছে বক।

সেদিন খাদ্য আর মানুষ পাঠানোর পালা ছিল পাণ্ডবদের আশ্রয়দাতা সেই ব্রাহ্মণের। দুশ্চিন্তার অকূল সাগরে তলিয়ে যাচ্ছিলেন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। একটিই পুত্র তাঁদের, একটিই কন্যা। ঐ নরমাংসভোজীর করাল গ্রাসে কাকে তুলে দেবেন প্রাণ ধরে ?

সব শুনে কুন্তী বললেন, নিশ্চিন্ত থাকুন বিপ্রবর, কোন সন্তানকেই হারাতে হবে না আপনার।

ব্রাহ্মণ বিস্মিত, কী বলছেন, ভদ্রে ? কিভাবে তা সম্ভব ?

কুন্তী হাসলেন, গর্বের হাসি—উপায় আছে, বিপ্রবর। আজ খাদ্য নিয়ে আপনাদের পরিবার থেকে কেউ যাবে না। বাকি দায়িত্বটুকু ছেড়ে দিন আমার ওপর।

বিস্মিত ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে কুন্তী এসে দাঁড়ালেন পাঁচ পুত্রের সামনে। বললেন, বৎসগণ, আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণকে এই চরম বিপদের হাত থেকে রক্ষা করা আমাদের কর্তব্য। বলতে বলতে কুন্তী তাকালেন ভীমসেনের দিকে, যে পুত্রটির শারীরিক শক্তিমত্তায় তাঁর অগাধ আস্থা—বৎস, আজ এই পরিবারের

পক্ষ থেকে আহার্য নিয়ে তুমিই যাবে বকের কাছে।

চমকে উঠলেন যুধিষ্ঠির। অর্জুনের কুশলতার পাশাপাশি ভীমসেনের শক্তিও যে তাঁদের ভবিষ্যতের পাথেয়! সেই ভীমসেনকে জননী ঠেলে দিচ্ছেন এই চরম বিপদের মুখে? এক নরমাংস-ভোজীর খাদ্য হিসেবে?

আপত্তির সুর ধ্বনিত হল যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠে, এ আপনি কী বলছেন, মাতা? অপরের সন্তানকে রক্ষার জন্য মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিচ্ছেন আপন পুত্রকে? আপনি কি জানেন না ভীমসেনের ওপর আমাদের ভবিষ্যৎ কতখানি নির্ভর করছে?

কুন্তীর গলায় দৃঢ় প্রত্যয়, সব জানি, বৎস। কিন্তু মনে রেখো, এই ব্রাহ্মণ আমাদের আশ্রয়দাতা। তাঁর কাছে আমাদের ঋণ অশেষ। আজ এই বিপদের দিনে তাঁর পাশে দাঁড়ানো আমাদের পবিত্র কর্তব্য। তাছাড়া আমাদের ঋণ তো শুধু এই ব্রাহ্মণের কাছেই নয়, সমগ্র একচক্রা নগরীর কাছেই আমরা ঋণী। তাঁদেরই ভিক্ষাদত্ত অন্নে জীবিকানির্বাহ হচ্ছে আমাদের। তাই একচক্রার অধিবাসীদের এই স্থায়ী আতঙ্ক থেকে উদ্ধার করাও আমাদের কর্তব্য। আর—সস্নেহ দৃষ্টিতে ভীমসেনের দিকে তাকালেন কুন্তী—ভীমসেনের শক্তিমত্তার ওপর আমার পূর্ণ আস্থা আছে। হিড়িম্বর সঙ্গে সংগ্রামের সময় তার প্রমাণ তো আমরা সকলেই পেয়েছি। আমি নিশ্চিত জানি, অত্যাচারী বকের জীবনের আজই শেষ দিন। যাও বৎস, এ অত্যাচারের অবসান ঘটিয়ে ঋণমুক্ত করো আমাদের।

এর পর আর কী-ই বা বলার থাকে যুধিষ্ঠিরের। তিনি শুধু অনুরোধ করলেন, মাতা, বককে যে ভীমসেন নিহত করেছে, এ-কথা যেন আর কেউ জানতে না পারে। ঐ ব্রাহ্মণকে আপনি বিশেষভাবে সতর্ক করে দেবেন।

কুন্তীর আস্থার মর্যাদা রেখেই ফিরলেন ভীমসেন। বকের ভবনে গিয়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধে তাকে নিহত করলেন তিনি। তার অনু-

চরদের সতর্ক করে বলে এলেন—এরপর থেকে আর কেউ খাদ্যের জন্য নরহত্যা করলে তারও একই পরিণতি হবে। অনুচররা পালালো একচক্রা ছেড়ে।

উল্লাসের প্লাবন বয়ে গেল একচক্রা নগরীতে। একচক্রাবাসীরা আজ নির্ভয়। দূর হয়েছে মূর্তিমান অভিশাপ। কিন্তু কে এমন বীর যে নিহত করার শক্তি ধরে স্বয়ং বককে—প্রশ্নটা উঠেছিল স্বাভাবিকভাবেই। নগরবাসীরা জানতে চেয়েছিল সেই ব্রাহ্মণের কাছেই—কাল তো আপনারই পালা ছিল, আপনিই বলুন ঘটনাটা কী? কুন্তীর অনুরোধে সত্য গোপন করেছেন ব্রাহ্মণ। বলেছেন—কাল এক মন্ত্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণ এসেছিলেন আমার গৃহে। তিনিই মন্ত্রবলে এ বিপদ থেকে রক্ষা করেছেন আমাদের।

প্রাণাধিক পুত্রের জীবন বাজি রেখে ঋণশোধের স্বপ্ন দেখেছিলেন কুন্তী। স্বপ্ন সফল। কুন্তীর বুকে নিখাদ তৃপ্তি।

সেদিন সন্ধ্যায় সেই আশ্রয়দাতা ব্রাহ্মণের কুটিরে আশ্রয়প্রার্থী হলেন এক অচেনা ব্রাহ্মণ। সযত্নে তাঁর সৎকার করলেন ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী। এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন কুন্তী। আর প্রণামান্তে মুখ তুলেই চমকে উঠলেন—ব্রাহ্মণের চোখে কিসের যেন ইশারা! কী-যেন বলতে চান ব্রাহ্মণ।

আগন্তুক ব্রাহ্মণকে নিজেদের কক্ষে নিয়ে গেলেন কুন্তী। পিছু পিছু এগিয়ে গেল পাঁচ ভ্রাতা। আসন গ্রহণ করে চাপা-স্বরে ব্রাহ্মণ বললেন, মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন পাঠিয়েছেন আমাকে।

উৎসুক হয়ে উঠলেন কুন্তী, কী সংবাদ পাঠিয়েছেন তিনি, বিপ্রবর?

মহর্ষি আপনাদের জানাতে বলেছেন, পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর অনুষ্ঠিত হবে কিছুদিনের মধ্যেই। আপনার তৃতীয় পুত্রটিকে তিনি বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকতে বলেছেন।

পাঞ্চাল !

পুঁথির পাতায় পিছু-ফেরা। কৌরব রাজকুমারদের অস্ত্রশিক্ষা দেওয়ার পর গুরুদক্ষিণা চেয়েছিলেন আচার্য দ্রোণ—পাঞ্চালরাজ দ্রুপদকে বন্দী করে এনে দিতে হবে তাঁর সামনে। একদা-সখা দ্রুপদের ওপর এক প্রচণ্ড প্রতিশোধস্পৃহা জমা হয়ে ছিল দ্রোণের মনে। সেই ক্ষোভ মেটাতে তিনি সামনে দেখতে চেয়েছিলেন বন্দী দ্রুপদকে। চেষ্টা করেছিল দুর্যোধন, চেষ্টা করেছিল তার ঊনশত ভ্রাতা। সফল হতে পারে নি তারা, ফিরে আসতে হয়েছিল পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে। অতঃপর এগিয়েছিলেন অর্জুন, সঙ্গে ছিলেন ভীমসেন আর নকুল-সহদেব। অর্জুনের অপ্রতিরোধ্য আক্রমণে পরাজিত হয়েছিলেন পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ। বন্দী পাঞ্চালরাজকে নিয়ে আচার্য দ্রোণের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন অর্জুন। পূর্ণ হয়েছিল দ্রোণের প্রতিশোধস্পৃহা। দ্রুপদের রাজ্যের অর্ধাংশ অর্থাৎ চর্মণ্বতী নদী পর্যন্ত বিস্তৃত অহিচ্ছত্র নগরী অধিকার করে বাকি অর্ধাংশ অর্থাৎ মাকন্দী আর কাম্পিল্যপুরী দ্রুপদের হাতে ছেড়ে দিয়েছিলেন আচার্য দ্রোণ। তীব্র অপমানের বিষজ্বালা বুকে নিয়ে ফিরে গিয়েছিলেন দ্রুপদ।

সেই পাঞ্চাল! সেই দ্রুপদ! তাঁর কন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবর! কী ভূমিকা থাকতে পারে সেখানে পাণ্ডবদের, বিশেষত অর্জুনের, যে অর্জুনই বন্দী করে নিয়ে এসেছিলেন দ্রুপদকে?

দুর্বোধ্য রহস্য। বিমূঢ় যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করেন, এ সংবাদের মর্মার্থ কী, বিপ্রবর?

অসহায়ভাবে মাথা নাড়েন ব্রাহ্মণ, তা আমার জানা নেই। তবে মহর্ষি কৃষ্ণদ্বৈপায়ন জানিয়েছেন, উপযুক্ত সময়ে আপনাদের সঙ্গে সাক্ষাত করে সবকিছু বিস্তারিত জানাবেন তিনি।

কী-একটা ছবি যেন ধরা পড়ছে কুন্তীর চোখে। বিমূঢ় ভাবটা কাটিয়ে উঠে তিনি বললেন, তাঁর আদেশ আমরা পালন করব। আপনি শুধু মহর্ষিকে জানিয়ে দেবেন—আমরা পাঞ্চাল

অভিমুখে যাত্রা করেছি। তিনি যেন পথেই সাক্ষাত করেন আমাদের সঙ্গে।

তথাস্তু।

পঞ্চভ্রাতা অবুঝ দৃষ্টিতে তাকাল কুন্তীর দিকে। এত দ্রুত পাঞ্চাল যাত্রার সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেললেন মাতা? কুন্তী হাসলেন। ছবিটা স্পষ্ট হচ্ছে তাঁর চোখের সামনে।

পরদিন বিদায় নিলেন আগন্তুক ব্রাহ্মণ। আশ্রয়দাতার কাছে বিদায় নিয়ে আবার পথে নামলেন সপুত্র কুন্তীও। সারা জীবন ধরে অজানা পথই যেন তাঁর একমাত্র সঙ্গী হয়ে উঠেছে।

পথচলা আর প্রতীক্ষা আর অজানা ভবিষ্যতের ভাবনা। প্রতীক্ষা বেদব্যাসের। তিনি আসবেন। নির্দেশ দেবেন। বিদুর নেই। বেদব্যাস আছেন। দূরদর্শী বেদব্যাস।

এলেন বেদব্যাস। এই বয়সেও কত কর্মঠ, কত সচল মানুষটি। যেন সর্বত্র বিরাজমান, সর্বত্রই তাঁর স্বচ্ছন্দ গতিবিধি।

পিতামহের চরণবন্দনা করল পঞ্চপাণ্ডব। প্রণাম জানালেন কুন্তী। সকলকে আশীর্বাদ করে বেদব্যাস প্রথমেই প্রশ্ন করলেন, বৎস অর্জুন, তোমার অনুশীলন অব্যাহত আছে তো?

আছে পিতামহ। আপনার নির্দেশ আমি পালন করেছি অক্ষরে অক্ষরে।

শুনে সন্তুষ্ট হলাম, বৎস।

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, পিতামহ, আপনি পাঞ্চাল রাজকন্যা দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের জন্য অর্জুনকে বিশেষভাবে প্রস্তুত থাকার নির্দেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু কেন? পাঞ্চাল রাজকন্যার স্বয়ংবরের সঙ্গে আমাদের ভবিষ্যতের সম্পর্ক কী?

বেদব্যাসের গুম্ফশমশ্রুমণ্ডিত মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল কেমন-এক দুর্জ্ঞেয় হাসির আভাস, সম্পর্ক আছে বৎস, অতি গভীর সম্পর্ক আছে।

ব্যাখ্যা করে গেলেন বেদব্যাস। পাঞ্চালরাজ দ্রুপদের কন্যা দ্রৌপদী স্বয়ংবরা হবেন। কিন্তু অন্যান্য স্বয়ংবরের সঙ্গে একটা গুণগত পার্থক্য আছে দ্রৌপদীর স্বয়ংবরের। ধনুর্বিদ্যার এক সুকঠিন পরীক্ষার আয়োজন করেছেন দ্রুপদ। একটি সুদৃঢ় দুরানম্য শরাসন প্রস্তুত করিয়েছেন তিনি। কৃত্রিম আকাশযন্ত্রের মধ্যে স্থাপন করেছেন একটি লক্ষ্যবস্তু। ঐ শরাসনে জ্যা-রোপন করে উপর্যুপরি পাঁচটি শরে যিনি বিদ্ধ করতে পারবেন সেই লক্ষ্য-বস্তুকে, দ্রৌপদীর বরমাল্য নির্দিষ্ট থাকবে তাঁরই জন্য। সেই দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতে হবে অর্জুনকে, এবং বেদব্যাস নিশ্চিত—সফল হবেন অর্জুন। আর—এ সংবাদ বড় গোপন—নৃপতি দ্রুপদের একান্ত বাসনা পাণ্ডুতনয় অর্জুনকেই জামাতা হিসেবে পাওয়ার। অর্জুনের হাতেই তিনি পরাজিত হয়েছিলেন, সেই আর সুযোগে তাঁর রাজ্যের অর্ধাংশ অধিকার করে নিয়েছিলেন দ্রোণ। দ্রোণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ নিতে চান তিনি, উদ্ধার করতে চান নিজের রাজ্যার্ধ। এবং তিনি জানেন, মর্মে মর্মে বুঝেছেন, অর্জুন-সহায় দ্রোণকে পরাজিত করার সাধ্য তাঁর নেই। তাই তিনি অর্জুনকে জামাতা হিসেবে গ্রহণ করে তাঁরই সহায়তায় প্রতিশোধ নিতে চান দ্রোণের ওপর। আর ঠিক এইখানেই,হিসেবটা দুয়ে দুয়ে চার। দুর্যোধনের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য মিত্র চাই পাণ্ডবদের, চাই অর্থ, লোকবল। শক্তিশালী, সমৃদ্ধিশালী পাঞ্চাল থেকে তা তাঁরা পাবেন অনায়াসেই।

যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, কিন্তু পিতামহ, অর্জুনকে জামাতা রূপে পাওয়ার বাসনা কী করে জাগতে পারে নৃপতি দ্রুপদের মনে? দেশের সকলেই তো জানে জতুগৃহের আগুনে মৃত্যু ঘটেছে আমাদের!

আবার হাসলেন বেদব্যাস, হ্যাঁ, সকলেই তা-ই জানে, তা সত্য। তবে দ্রুপদের কাছে অন্য একটা সংবাদও প্রেরিত হয়েছে লোকমুখে। দ্রুপদ জেনেছেন, তোমরা জীবিত।

যুধিষ্ঠির উদ্বিগ্ন, কে প্রেরণ করেছে সে সংবাদ? আপনি স্বয়ং?

রহস্যের হাসি হাসলেন বেদব্যাস। উত্তর দিলেন না। কিছুক্ষণ সবাই নির্বাক। তারপর এতক্ষণের জমে-ওঠা প্রশ্নটা উচ্চারণ করলেন তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন, কিন্তু পিতামহ, স্বয়ংবর-সভায় আমাদের যেতে হবে ছদ্মবেশে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের আগে ঐ দুরূহ পরীক্ষায় অগ্রসর হওয়ার সুযোগ পাবেন রাজন্যবর্গ। তাঁদের মধ্যে থেকে কেউ তো আমার আগেই উত্তীর্ণ হতে পারেন পরীক্ষায়। সেক্ষেত্রে বরমাল্যের অধিকারী তো তিনিই হবেন, অগ্রসর হওয়ার সুযোগই তো পাবো না আমি!

সঙ্গত প্রশ্ন। চমকে উঠলেন চার পাণ্ডব। আরও বেশি করে চমকে উঠলেন জননী কুন্তী। তাঁর মাথায় এক পুরনো দৃশ্যের বিদ্যুৎপ্রতিম চলাচল।

কিন্তু বেদব্যাস স্থির, না বৎস, যে-কোন ব্যক্তির পক্ষে ঐ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব নয়। ভীষ্ম বা দ্রোণ হয়ত পারতেন, কিন্তু স্বয়ংবর-সভায় তাঁদেরকে প্রতিযোগী ভাবা বাতুলতা মাত্র। সেক্ষেত্রে তুমি বাদে আর মাত্র তিনটি মানুষকে আমি জানি, যাঁরা উত্তীর্ণ হতে পারেন ঐ পরীক্ষায়। প্রথমজন আচার্যতনয় অশ্বত্থামা। কিন্তু দ্রুপদকন্যার জন্য পুত্রকে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হওয়ার অনুমতি আচার্য দ্রোণ কখনোই দেবেন না। ফলে তাকে বাদ দেওয়া যায় অনায়াসেই। দ্বিতীয় জন—বলতে বলতে একটু থেমে গেলেন বেদব্যাস, গভীর কৌতূহলে নিরীক্ষণ করলেন প্রতিটি শ্রোতাকে, তারপর বললেন—দ্বিতীয় জন তোমাদের প্রত্যেকেরই একান্ত পরিচিত—সূতপুত্র কর্ণ।

হৃদস্পন্দন কি স্তব্ধ হয়ে গেল কুন্তীর?

ব্যাসদেব বলে চললেন, হ্যাঁ, কর্ণ পারে, অনায়াসেই পারে। এবং স্বয়ংবর-সভায় তোমরা যেহেতু উপস্থিত থাকবে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে, সেহেতু অঙ্গরাজ কর্ণ তোমাদের আগেই অগ্রসর হওয়ার

সুযোগ পাবে।

যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠে ব্যাকুল জিজ্ঞাসা, তাহলে? সূতপুত্র পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হলে……

উদ্বিগ্ন হোয়ো না, বৎস—বেদব্যাস অবিচল - অগ্রসর হলেও পরীক্ষায় অবতীর্ণ হওয়ার সুযোগ পাবে না কর্ণ। সে দায়িত্ব স্বয়ং দ্রুপদই গ্রহণ করবেন।

তা কী করে সম্ভব? নকুল জিজ্ঞাসু।

সব প্রশ্নের উত্তর এখনই জানতে চেয়ো না, বৎস। যথাসময়ে সবই জানতে পারবে।

কুন্তীর দিকে তাকালেন বেদব্যাস, বৎসে, তোমার সঙ্গে কিছু গোপন কথা আছে আমার।

ধীরে ধীরে উঠে দাঁড়ালেন কুন্তী। মাথার মধ্যে সব কেমন এলোমেলো। গভীর জট।

কুন্তীর সঙ্গে একান্তেকথা বলার জন্য অগ্রসর হচ্ছিলেন বেদ-ব্যাস, ঠিক তখনই জ্যামুক্ত তীরের মতো প্রশ্নটা ছিটকে বেরোল অর্জুনের মুখ থেকে, আর সেই তৃতীয় জন?

ঘুরে দাঁড়ালেন বেদব্যাস। অস্বাভাবিক এক গাম্ভীর্য এখন তাঁর চোখেমুখে। স্থির দৃষ্টিতে অর্জুনের দিকে চোখ রাখলেন তিনি—বৎস অর্জুন, আমার স্থির বিশ্বাস সেই তৃতীয় জনই হয়ে উঠবে তোমাদের ভবিষ্যতের রূপকার। তোমারই সমবয়সী সেই যুবক উপস্থিত থাকবে স্বয়ংবর-সভায়। কিন্তু জেনে রাখো, দ্রৌপদীলাভে সে অভিলাষী নয়। তোমাদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের উদ্দেশ্যেই সে আসবে পাঞ্চালে। বিদুর তাকে সংবাদপ্রেরণ করেছে।

কে সেই যুবক, পিতামহ?

তার পরিচয়ও তোমরা যথাসময়েই পাবে। শুধু এইটুকু জেনে রাখো এখন—সে তোমাদের নিকটাত্মীয়।

স্তম্ভিত পঞ্চভ্রাতার সামনে দিয়ে পুত্রবধূকে নিয়ে নির্জনে

গিয়ে চললেন বেদব্যাস।

বেদব্যাস বললেন, পুত্রী, তোমাকে এখন যে কথা বলতে চলেছি আমি, তা শুনতে হয়ত বিসদৃশ লাগবে তোমার। তবু জেনো, আমার উপদেশ প্রতিপালনেই তোমাদের মঙ্গল।

বলুন মহাত্মন্। আপনার উপদেশ পালনে এতটুকু অন্যথা হবে না আমার।

অন্যদিকে চোখ ফেরালেন প্রাজ্ঞ মানুষটি, হয়ত সংকোচে অথবা অন্যতর কোন গভীর উদ্দেশ্যে—পুত্রী, তোমার পঞ্চপুত্রের মধ্যে দ্রুপদকন্যাকে জয়করার সামর্থ্য একমাত্র অর্জুনেরই আছে। কিন্তু, আবার বলছি, কথাটা হয়ত অসঙ্গত, তবু—দ্রুপদকন্যার সঙ্গে বিবাহ হবে তোমার পঞ্চপুত্রেরই, একা অর্জুনের নয়।

যতটা বিস্মিত হওয়া স্বাভাবিক, ততটা বিস্ময় কিন্তু দেখা গেল না কুন্তীর মুখমণ্ডলে। বেদব্যাসের প্রতিটি কথায় তিনি বারবার উপলব্ধি করেছেন, সামগ্রিক রাজনীতির কোন জটিল সন্ধিক্ষণ এগিয়ে আসছে। বিস্মিত না হওয়ার অন্য কোন গভীর-তর কারণও হয়ত ছিল কুন্তীর। কিন্তু সে প্রসঙ্গ এখন অপেক্ষাতেই থাক।

কুন্তী প্রশ্ন করলেন, আপনার আদেশ শিরোধার্য মহাত্মন্। কিন্তু এ আদেশ আপনি কেন দিচ্ছেন, তা জানার অধিকার কি আছে আমার?

অবশ্যই আছে, বৎসে। হস্তিনাপুরের সিংহাসনে নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠারজন্য সবথেকে বেশি করে প্রয়োজন তোমার পঞ্চ-পুত্রের অটুট ঐক্য। এখনও পর্যন্ত সে ঐক্য অটুটই আছে। কিন্তু দ্রৌপদীর মতো অসামান্যা সুন্দরী কন্যা একা অর্জুনের স্ত্রী হলে তোমার বাকি চার পুত্রের মধ্যে একটা ঈর্ষার ভাব দেখা দেওয়া একান্তই স্বাভাবিক। এ পৃথিবীতে আজ পর্যন্ত নারীকে কেন্দ্র করে অজস্র অঘটন ঘটে গেছে, অভিন্নাত্মা ভ্রাতাদের মধ্যেও বেধেছে

চরম বিরোধ—এ তো তোমারও অজানা নয়। তাছাড়া শুধু বিপদের আশংকা এড়ানোই নয়, পঞ্চভ্রাতা এক স্ত্রীতে আসক্ত হলে তাদের মধ্যেকার প্রীতির বন্ধন আরও গভীরতর হয়ে উঠবে বলেই আমার বিশ্বাস। এইসব বিচার-বিবেচনা করেই আমি দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামিত্বের সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি, পুত্রী।

মনস্তত্ত্ব আর রাজনীতির নিখুঁত সমন্বয়। মানুষটি যে সত্যই দূরদর্শী, তাতে সন্দেহের কোন অবকাশই নেই। শুধু একটি জায়গায় একটি খুঁত চোখে পড়ে কুন্তীর, যে-দিকটি অনুভব করার অবকাশ হয়ত জীবনে পাননি মানুষটি। বলতে সংকোচ, তবু বলতেই হয়! কুন্তী বলেন, মহাত্মন্, আপনি প্রজ্ঞাবান। আপনার কথার প্রতিবাদ করার মতো ধৃষ্টতা আমার নেই। শুধু একটা বিষয় আপনাকে একটু ভেবে দেখতে অনুরোধ করছি।

বলো পুত্রী।

মহাত্মন্, দ্রুপদকন্যাকে যদি জয় করে আনে অর্জুন আর তার-পর যদি পঞ্চভ্রাতার সঙ্গেই বিবাহ হয় সেই কন্যার, তাহলে অর্জুনের পক্ষে কি মনের দিক থেকে তা মেনে নেওয়া সম্ভব হবে? তার কি মনে হবে না তার অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হচ্ছে অন্যায়ভাবে?

এতক্ষণে বৃদ্ধ মানুষটির চোখে বিস্ময় ফোটে। আশ্চর্য, এত-কিছু ভেবেছেন তিনি, অথচ মানবচরিত্রের এই বিশেষ দিকটা যে তাঁর চিন্তার বাইরেই রয়ে গেছে!

বহুক্ষণ কথাহীন বসে রইলেন বেদব্যাস। হয়ত উপায় খুঁজ-লেন মন-অতলে ডুব দিয়ে। অবশেষে তাঁর কণ্ঠস্বরে ফুটে উঠল গভীর অসহায়তা, না বৎসে, এ সমস্যার কোন সমাধান আমার জানা নেই। আমি অসহায়। এক্ষেত্রে সেই গুরুদায়িত্ব পালন করতে হবে তোমাকেই।

আমাকে? কিন্তু কিভাবে, মহাত্মন্?

জানি না, বৎসে। কিভাবে এ দায়িত্ব পালন করবে তুমি, তা আমি বলে দিতে পারব না। উপায় খুঁজে বার করতে হবে তোমা-

কেই। তুমি বুদ্ধিমতী। আমি আশা করি এমন একটা পন্হা তুমি নিশ্চয়ই খুঁজে বার করতে পারবে যাতে তার জয়লব্ধা নারীর সঙ্গে পঞ্চভ্রাতার বিবাহ হওয়া সত্ত্বেও অর্জুন নিজেকে বঞ্চিত বলে মনে করার সুযোগ পাবে না, মেনে নেবে অমোঘ ভবিতব্য বলেই। এ দায়িত্ব আমি তোমার ওপরেই ন্যস্ত করে গেলাম।

কোন নিথে সমুদ্রের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন কুন্তী। একটি সন্তানকে নিঃসংশয়ে বঞ্চিত করেও কিভাবে তাকে সরিয়ে রাখবেন সেই বঞ্চনার জ্বালা থেকে, তা তাঁর জানা নেই। কিন্তু আপাতত আরও কিছু প্রশ্নের ভীড় তাঁর চিন্তায়।

উৎকণ্ঠার ছোঁয়া লাগল কুন্তীর গলায়, একটু আগে আপনি বললেন দুর্যোধনের সঙ্গে যুদ্ধের জন্য মিত্র চাই আমার পুত্রদের, চাই অর্থ, লোকবল। কিন্তু যুদ্ধের প্রসঙ্গ এখনই উঠছে কেন, মহাত্মন্? যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন পথ কি নেই?

হয়ত আছে, পুত্রী। তবে আমার ধারণা—ধারণাই বা বলি কেন, আমার স্থির বিশ্বাস-এ দ্বন্দ্বের চরম মীমাংসা রণক্ষেত্রেই হবে। কিন্তু এ প্রশ্ন কেন, পুত্রী? তুমি ক্ষত্রিয়নারী। সন্তানদের রণক্ষেত্রে পাঠিয়েই তো আনন্দিত হবে তুমি। ক্ষত্রিয় নারীর সে-ই তো পরম গৌরব।

দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন কুন্তী, মহাত্মন্, আমি ক্ষত্রিয়নারী ঠিকই, কিন্তু সবার আগে আমি যে শুধুই নারী! জীবনে অনেক কিছু হারিয়েছি, আর কিছু হারানোয় তা-ই বড় ভয় আমার।

উত্তর জানা নেই বেদব্যাসের। দক্ষিণ হস্তটি প্রসারিত করে শুধু গভীর মমতায় আশীর্বাদ করলেন তিনি, পুত্র হারানোর যন্ত্রণা যেন তোমাকে কোনদিন স্পর্শ না করে, বৎসে।

অন্তর্ভেদী চোখ দুটিতে কি কয়েক-বিন্দু অশ্রুর আভাস দেখা গেল বৃদ্ধ মানুষটির?

উঠে পড়লেন বেদব্যাস। এখনও অনেক কাজ বাকি তাঁর। যেতে হবে অনেক দূর।

বেদব্যাস পথে পা রাখার ঠিক আগে শেষ প্রশ্নটি করলেন কুন্তী, সেই তৃতীয় জন কে, তা কি আমাকেও বলা চলে না, মহাত্মন্ ?

মাথা নাড়লেন বেদব্যাস, না বৎসে, তার পরিচয় সে নিজেই দেবে। তবে তোমাকেও বলে যাই, সে যুবক তোমার নিকটাত্মীয়, বড় আপনার জন।

৯

চলতে চলতে এত দূর। ভবিষ্যৎকে নিজের মতো করে সাজাতে চেয়ে জীবনভোর দীর্ঘযাত্রা মানুষের। ভবিষ্যৎ: এক চির-অজানা মোহ, চির-অধরা স্বপ্নভূমি। সারাটা জীবন জুড়েই মানুষের সামনে ঝুলে থাকে ভবিষ্যৎ নামক একটি চিকন শব্দ এবং মানুষ চলতে থাকে ছুটতে থাকে জীবনপণ শব্দটিকে ধরতে চেয়ে জানতে চেয়ে আর অন্তিমে কোথাও নিষ্ঠুর পরিহাসে হা-হা হাসে আবেগহীন অদৃশ্য শব্দটি।

চলতে চলতে এতদূর। সোমাশ্রয়ণ তীর্থ হয়ে, জাহ্নবীর উত্তাল জলরাশির তীর ছুঁয়ে ছুঁয়ে, উৎকোচক তীর্থ অতিক্রম করে—পাঞ্চাল। ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এক কুম্ভকারের কুটিরে আশ্রয় নিয়েছেন কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডব। গুম্ফশ্মশ্রুর ঘন আস্তরন ভেদ করে তাঁদের চেনা এখন বেশ কষ্টকর—একমাত্র ভীমসেনের মুখমণ্ডলেই গুম্ফশ্মশ্রুর কিছুটা অভাব চোখে পড়ে।

এখানেও ভিক্ষাই জীবিকা। সারা দিন পাঞ্চালের পথে পথে ঘোরে পাণ্ডব ভ্রাতারা। চলার পথে সংগৃহীত হয় নানান সংবাদ। এগিয়ে আসছে পাঞ্চাল রাজকন্যার স্বয়ংবরের দিন। মানুষের মুখে মুখে উত্তেজিত আলোচনা। স্বয়ংবর-সভায় সবারই অবাধ অধিকার। যে পারবে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে, সে-ই লাভ করবে পাঞ্চালীকে। কে পারবে লক্ষ্য বিদ্ধ করতে? নানা জনের নানা মত। কেউ বলে কর্ণের নাম, কেউ বলে জরাসন্ধ, কারুর মতে যোগ্যব্যক্তি শিশু-

পাল অথবা শল্য, আবার কারুর মুখে উচ্চারিত হয় পৌণ্ড্রক বাসুদেবের নাম। না, অর্জুনের নাম শোনা যায় না পাঞ্চালবাসীর মুখে। কারণ অন্যান্য সবার মতো পাঞ্চালবাসীরাও জানে—জতুগৃহের সর্বগ্রাসী আগুনে মৃত্যু হয়েছে অদ্বিতীয় ধনুর্ধর তৃতীয় পাণ্ডবের।

এর মধ্যে আর-একবার দেখা দিয়েছিলেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস। আশ্বাস দিয়ে গেছেন, নিশ্চিন্ত থাকতে বলেছেন।

পুত্ররা ঘুরে বেড়ায় ভিক্ষার সন্ধানে, অর্জুন ব্যস্ত থাকে নিবিড় অনুশীলনে। আশ্রয়দাতা কুম্ভকারের কুটিরে চিন্তার দুস্তর সাগরে ডুবে যান একাকিনী কুন্তী।

এগিয়ে আসছে দ্রুপদতনয়ার স্বয়ংবর। বেদব্যাসের ব্যবস্থামতো হয়ত অর্জুনই লাভ করবে সেই মেয়ের বরমাল্য। ঘরে আসবে পুত্রবধূ। হিড়িম্বাকে কাছে পান নি কুন্তী, দেখার সৌভাগ্য হয় নি প্রথম পৌত্র ঘটোৎকচের মুখ। কিন্তু দ্রৌপদীকে কাছে পাবেন, জননী কুন্তী রূপান্তরিতা হবেন শ্বশ্রূমাতায়। তারপর পৌত্র, পৌত্রী···আহা, কত রাতজাগা স্বপ্নের সেইসব শিশুমুখ······

অথচ এই খুশিমেশা ভাবনার মধ্যে থেকেই মাথা তোলে অসহায়ত্ব। পঞ্চপুত্রের ভার্যা হবে পাঞ্চালদুহিতা। হয়ত ঠিকই বলেছেন বেদব্যাস, পঞ্চভ্রাতার চিরস্থায়ী বন্ধনের জন্য এ বিবাহ হয়ত একান্তই অপরিহার্য। কিংবা হয়ত কোথাও কোন ভ্রান্তি আছে স্বয়ং বেদব্যাসের হিসেবেও। ভিন্ন ভিন্ন নারীর সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হয়েও অটুট থেকেছে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন—এমন দৃষ্টান্তও তো বিরল নয় পৃথিবীতে! সঠিক-বেঠিক নির্ণয় করে উঠতে পারেন না কুন্তী। অর্জুন যাতে কোনভাবেই নিজেকে বঞ্চিত মনে না করে, চার ভ্রাতার প্রতি কোন বিদ্বেষ যাতে জন্ম না নেয় তার মনে—তার উপায় নির্ধারণের দায়িত্ব তাঁর ওপরেই দিয়ে গেছেন বেদব্যাস। কিন্তু আজও তেমন কোন উপায় ভেবে উঠতে পারেন নি কুন্তী। ভেবেছেন, অনেক ভেবেছেন, নানান পন্হার কথা মাথায়

এসেছে। কিন্তু এগোতে পারেন নি এক পা-ও। আজও কুন্তী অন্ধকারে।

আর এই অন্ধকারের গভীর থেকে, বেদব্যাসের নির্দেশের সীমানা পেরিয়ে, কুন্তীর অবচেতন জুড়ে ধীরে ধীরে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে অন্য এক জ্বালা, অন্য কিছু বিবর্ণ স্মৃতির কশাঘাত।

পাঞ্চাল রাজকন্যার স্বয়ংবরে যাবে তাঁর পুত্ররা। বহু বছর আগে একদিন এমনই এক স্বয়ংবর-সভাতেই তিনি প্রথম দেখেছিলেন পাণ্ডুকে, বরমাল্য দিয়েছিলেন সেই পুরুষের কণ্ঠে। জীবনে পুরুষ এসেছিল। কিন্তু শরীরে, আহ্, এই শরীরে, পাণ্ডুই তো প্রথম পুরুষ ছিলেন না! তার আগেই যে পারিজাতের ঘ্রাণ নিয়ে চলে গেছেন দুর্বাসা! প্রথম পুরুষ হতে পারেন নি পাণ্ডু, কিন্তু শেষ পুরুষও যে নন তিনি! শতশৃঙ্গ পর্বতের সেই আরণ্যক পটভূমিতে আরও তিন তিনটি পুরুষ—ধর্ম, বায়ু, ইন্দ্র—যে একে একে এসে দাঁড়িয়েছিলেন এই শরীরের নীল উপত্যকায়।

পাঁচজন। কুন্তীর শরীরে পাঁচ-পাঁচটি পুরুষের সতৃষ্ণ পদক্ষেপ। পাঁচটি সুস্পষ্ট চিহ্ন। আর এই সেই গভীরতর কারণ, যার জন্য বেদব্যাসের মুখে পঞ্চপুত্রের সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহের প্রস্তাব শুনে ততটা বিস্মিত হন নি তিনি।

নারীদের বহুস্বামিত্ব অথবা বিভিন্ন পুরুষের সঙ্গে সংসর্গ একসময় যথেষ্টই প্রচলিত ছিল সমাজে। কালের বিবর্তনে তা বিরল হয়ে এসেছে ক্রমে ক্রমে। কয়েকটি বিশেষ গোষ্ঠী ছাড়া এ ঘটনা এখন সমাজের চোখে নিন্দনীয়। নিজের জীবনের যাবতীয় ঘটনার পরেও সমাজের এ প্রভাব আজও কাটিয়ে উঠতে পারেন নি কুন্তী। বরং দিনে দিনে আরও বেশি করে, আরও তীব্রভাবে এ প্রভাব ছাপ ফেলেছে তাঁর মনে। আচ্ছন্ন হয়েছেন অপরাধবোধে। সত্তার সর্বত্র জুড়ে প্রসারিত হয়েছে সেই অপরাধবোধ। আর চোখের সামনে, জানাচেনার পরিধিতে, উচ্চবংশের এমন একজন নারীর সন্ধানও বর্তমানের প্রেক্ষাপটে খুঁজে পান নি তিনি, যে নারী জীবনে বা

শরীরে গ্রহণ করেছে বহু পুরুষকে। তাহলে? তাহলে ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তিনিই কি হয়ে থাকবেন এক নারীর শরীরে বহু পুরুষের বীজবপনের অন্তিম দৃষ্টান্ত? শেষ উদাহরণ?

না! শেষ দৃষ্টান্ত হবেন না কুন্তী। তাঁর সামনে এখন এক সুবর্ণ সুযোগ। দ্রুপদনন্দিনী! এবং তাঁর পঞ্চপুত্র! একটি নারী, পাঁচজন পুরুষ! আশ্চর্য সাদৃশ্য! তাঁর নিজের জীবনেও এসেছিল পাঁচজন পুরুষ আর আজ দ্রৌপদীকেও ঠিক পাঁচজন পুরুষের হাতে সমর্পণের উজ্জ্বল সম্ভাবনা। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় অন্তিম দৃষ্টান্ত যদি কাউকে হতেই হয়, তাহলে সে ভূমিকা পালন করতে হবে দ্রৌপদীকেই।

বেদব্যাসের নির্দেশের রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক অর্থ ছাপিয়ে অন্যতর এক সুদৃঢ় সংকল্পে পৌঁছে যান কুন্তী।

আর সেইসঙ্গেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে রঙ্গভূমিতে দেখা বুক-কাঁপানো সুখ-জাগানো সেই মুখটি, যে, নিঃসংশয়ে স্বীকার করে গেছেন বেদব্যাস, পারে ঐ দুরূহ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হতেঃ কর্ণ। সূতপুত্র কর্ণ। কুন্তীর ত্রাস, কুন্তীর মমতা। তাকে পরীক্ষায় অবতীর্ণ হতে না দেওয়ার জন্য কী উপায় উদ্ভাবন করেছেন বেদব্যাস, কুন্তী জানেন না। কিন্তু কোথায় যেন বেদনার শঙ্খরোল, কষ্ট, জ্বালা। বিদুর বলেছিলেন, কর্ণ এক পরিত্যক্ত মানবসন্তান। হায় দুর্ভাগা! তোর এ শূন্যতা ভরিয়ে তোলার সাধ্য যদি থাকত আমার! মনে পড়ে অশ্বনদীর সেই জলোচ্ছ্বাস, আমার প্রথম সন্তান, এই হাতে, এই নির্মম রাক্ষসী হাতে, তাকে সঁপে দেওয়া নিশ্চিত মৃত্যুর কবলে···যদি পারতুম, হায় রে পরিত্যক্ত মানবপুত্র, যদি পারতুম আমার সেই প্রথম সন্তানের স্বীকৃতি দিয়ে তোকে টেনে নিতে এই বুকে···অথচ পারি না আমি, কিছুতেই পারি না, কারণ তুই সে নোস্ আর তোর ঐ ভয়াল তূণীরেই নিদ্রাহীন জেগে থাকে আমার অর্জুনের মৃত্যুবাণ···পারি না, ওরে হতভাগ্য, পারি না আমি···

অনেক চোখের জলে সংযত হয় উথ্‌লে-ওঠা আবেগ। তখন মাথার মধ্যে ঘণ্টা বাজায় আর-একজন। কে সেই তৃতীয় যুবক, যার ইঙ্গিত দিয়ে গেলেন বেদব্যাস? কে এমন নিকটাত্মীয়, বড় আপনার জন আছে কুন্তীর, যে হয়ে উঠতে পারে তাঁর পুত্রদের ভবিষ্যতের রূপকার? কে?

জননী কুন্তীকে প্রণাম করে স্বয়ংবর-সভায় যোগ দেওয়ার জন্য যাত্রা করলেন পঞ্চপাণ্ডব। জননীর বুকভরা আশীর্বাদ মাথায় নিয়ে পথের বাঁকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন পাঁচ ভ্রাতা। পরনে ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশ।

পাঞ্চালনগরীর কুম্ভকারের গৃহে কুন্তী একা। তিনি জানেন স্বয়ংবর আজ অনুষ্ঠিত হবে না। এখন পনের দিন ধরে চলবে নৃত্য, গীত, অভিনয়। অবশেষে ষোড়শ দিবসে অনুষ্ঠিত হবে সেই মহাপরীক্ষা। অর্থাৎ, এখন ষোলটা দিন কুন্তী একাকিনী। এতদিনের জীবনে এই প্রথম এতগুলো দিনসম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ কাটাতে হবে তাঁকে।

এই ষোল দিন জননীর ভরণপোষনের ভার আশ্রয়দাতা কুম্ভকারের ওপরেই দিয়ে গেছেন যুধিষ্ঠির। সাধ্যমতো দায়িত্ব পালন করে কুম্ভকার। আর কেমন এক দীনতায় আক্রান্তা হন কুন্তী। আজ তিনি পরান্নভোজী। মাঝে-মাঝে কুন্তী ভাবেন—পাঁচ পুত্রেরই কি কোন প্রয়োজন ছিল স্বয়ংবর-সভায় যাওয়ার? ধনুর্বাণ হাতে উঠে দাঁড়াবে তো একা অর্জুনই। কোন আকস্মিক বিপদে তাঁর সহায়তার জন্য পাশে থাকতে পারতেন ভীমসেন। কিন্তু বাকি তিন পুত্রের তো প্রায় কোন ভূমিকাই নেই সেখানে। কেন গেল তারা? অসহায়া জননীকে এক প্রায়-অপরিচিত কুম্ভকারের ভরসায় ফেলে রেখে যেতে এতটুকু সংকোচ হল না তাদের? অন্তত একজনও যদি থাকত কাছে, তাহলেও তো নিজেকে এতটা অনাথা বলে মনে হত না তাঁর!

ভাবেন কুন্তী, ব্যথা পান, গলার কাছে দলা পাকায় অভিমান আর তারই পাশাপাশি অনুভব করেন কারণটাও। দ্রৌপদীর অবর্ণনীয় রূপলাবণ্য, উথাল-হিয়া যৌবনের দুর্নিবার আকর্ষণ। পাঞ্চালতনয়ার রূপযৌবন মানুষের মুখে মুখে প্রায় প্রবাদে পরিণত হয়েছে। যে-কোন পুরুষের মনে শ্যামাঙ্গী মেয়েটি জাগিয়ে তুলতে পারে কালবৈশাখীর ঝোড়ো নাচন।

জীবনের অজস্র অভিজ্ঞতায় সমৃদ্ধা কুন্তী। একাধিক পুরুষকে তিনি দেখেছেন খুব কাছ থেকে। পুরুষচরিত্র তাই অজানা নয় তাঁর। কুম্ভকারের কুটিরে একান্তে বসে উপলব্ধি করেন কুন্তী—সেই স্বপ্নপ্রতিম শ্যামাঙ্গী কন্যাটিকে দেখার আশায় অস্থির হয়েই স্বয়ংবর-সভায় ছুটে গেছেন তাঁর পঞ্চপুত্র। ব্যাসদেব আশ্বাস দিয়ে গেলেও কোন অভাবনীয় অঘটনে অর্জুন তো না-ও জয় করতে পারেন সেই মেয়েকে! সেক্ষেত্রে, স্বয়ংবর-সভায় সশরীরে উপস্থিত থাকতে না পারলে সেই অপরূপা নারীকে একবার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করা থেকেও যে বঞ্চিত হতে হয়! না, এই দুর্বার প্রলোভন জয় করতে পারে নি তাঁর পুত্ররা। ছুটে গেছে অস্থির চাঞ্চল্যে আর সেই চঞ্চলতার আবিল অন্ধকারে তাদের মনে পড়েনি—এতগুলো দিন একাকিনী পড়ে থাকতে হবে জননীকে, পরান্নভোজী হয়ে। ব্যথার হাসি ফোটে কুন্তীর ওষ্ঠপ্রান্তে।

নানান সংবাদ নিয়ে আসে কুম্ভকার। দেশ-দেশান্তর থেকে পাঞ্চালনগরীতে এসে সমবেত হয়েছেন রাজন্যবর্গ। এসেছেন জরাসন্ধ, শিশুপাল, মৎস্যরাজ বিরাট, ভগদত্ত, পৌণ্ড্রক বাসুদেব। এসেছেন মাদ্রীভ্রাতা শল্য আর তাঁর পুত্ররা। হস্তিনাপুর থেকে এসেছে দুর্যোধন, দুঃশাসন, গান্ধাররাজ শকুনি। তাঁদের সঙ্গী হিসেবে দেখা গেছে দ্রোণতনয় অশ্বত্থামাকেও। আরও কত কত রাজা-রাজড়া যে সমবেত হয়েছেন, বলে শেষ করতে পারে না কুম্ভকার। নগরীর উত্তর-পূর্বদিকে একটি বিশাল সমতলভূমিকে রাজশিল্পীরা সাজিয়ে তুলেছে স্বয়ংবর-সভা হিসেবে। চারদিক অসংখ্য

প্রাচীর আর পরিখায় ঘেরা। মাঝে-মাঝে এক-একটা সিংহদ্বার। সুগন্ধমিশ্রিত জল ছিটিয়ে দিয়ে যাচ্ছে পরিচারকরা। ব্রাহ্মণদের জন্য নির্দিষ্ট হয়েছে পৃথক আসন। স্বয়ংবর দেখার জন্য উৎসুক নগরবাসীরা উঠে পড়েছে গাছের ওপর। সব মিলিয়ে সে এক ধুন্ধুমার কাণ্ড চলছে।

শুনতে শুনতে উন্মুখ হয়ে ওঠেন কুন্তী। উদগ্র কৌতূহল গোপন করে খুব নিস্পৃহ স্বরে জানতে চান, এত রাজারাজড়ার নাম করলে, কৈ, অঙ্গরাজ কর্ণের কথা তো বললে না? তিনি আসেন নি বুঝি?

উৎসাহিত হয়ে ওঠে কুম্ভকার, কী বলছেন আর্যে, তিনি আবার আসবেন না? ঐ হস্তিনাপুরের দুর্যোধনদের সঙ্গেই তো এসে-ছেন তিনি। সবাই বলাবলি করছে তিনিই নাকি জয় করে নিয়ে যাবেন আমাদের রাজকুমারীকে। তীরধনুক হাতে নিলে তাঁকে ঠেকানোর সাধ্যি নাকি কারুর নেই।

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন কুন্তী। তাহলে এসেছে কর্ণ! আর সেই তৃতীয় জন? এসেছে সে?

কুন্তী প্রশ্ন করেন, আর কারা কারা এসেছে, বাবা?

অবজ্ঞায় হাত নাড়ে কুম্ভকার, কী জানি আর্যে, কত্তসব রাজাদের ভীড়, সব নাম কি আর মনে রাখা যায়?

চুপ করে যান কুন্তী। কুম্ভকার শুধোয়, কিন্তু আর্যে, আপনার পুত্ররা ওখানে কী করতে গেলেন? ওঁরা তো আর তীর-ধনুক চালাতে পারবেন না।

তা তো পারবেই না—একটু যেন বেশিই জোর দিয়ে কথা বলেন কুন্তী—ওরা গেছে স্বয়ংবর দেখতে। কত দূর দূর থেকে সব ব্রাহ্মণরা এসেছে, আর এত কাছে থেকে এমন একটা অনুষ্ঠানে ওরা উপস্থিত থাকবে না, সেটা কি ভাল দেখায়?

হুঁ, তা অবশ্য সত্যি—বলতে বলতে মুখটা উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কুম্ভকারের—তাছাড়া ওখানে ব্রাহ্মণদের প্রাপ্তিযোগও ভালই ঘটবে।

ও-সব ব্যাপারে আমাদের মহারাজ কোন কার্পণ্য করবেন না। অনেক কিছু নিয়ে ফিরবে আপনার পুত্ররা, দেখে নেবেন।

সরে আসেন কুন্তী। নির্জনে গিয়ে বসেন। অনেক কিছু নিয়ে আসবে তাঁর পুত্ররা। পুত্ররা নয়, একটিমাত্র পুত্রই নিয়ে আসবে 'অনেককিছু!' কিন্তু সেই সম্পদকে পঞ্চপুত্রের সার্বজনীন সম্পদে পরিণত করতে হবে তাঁকে। কিভাবে? জানেন না, এখনও জানেন না কুন্তী—কিভাবে তা সম্ভব। সমাধানের পথ দেখাতে পারেন নি স্বয়ং মহাপ্রাজ্ঞ বেদব্যাস। এই সময়, এই অসহায় প্রহরে, কুন্তীর ভীষণ ভীষণ প্রয়োজন ছিল সেই মানুষটিকে, সেই প্রাজ্ঞ, স্থিতধী, বিচক্ষণ মানুষটিকে, কুন্তীর জীবনজুড়ে যে দাঁড়িয়ে আছে অনির্বাণ বর্তিকা হয়ে, যার চোখে কুন্তী খুঁজে পান এক বাতিঘর। কিন্তু সে নেই, তাকে এখন পাওয়া অসম্ভব। হস্তিনা-পুরের মহামন্ত্রীর পক্ষে রাজ্যের দায়িত্ব ফেলে রেখে সম্ভব নয় এতদূরে ছুটে আসা। বিদুর, বিদুর, যদি আসতে একবার, যদি বলে দিয়ে যেতে আমার কী করণীয়···

দিন ফুরোয়, রাত ফুরোয়। এক-একটি দিন যেন এক-এক বছর করে বয়স বাড়িয়ে দিয়ে যায় পাণ্ডবজননীর। এখান-সেখান থেকে আরও কিছু সংবাদ সংগ্রহ করে আনে কুম্ভকার। কুন্তী শোনেন। ভাবেন। উতলা হন।

মহাকাল নির্বিকার হাসে। আরও দুস্তর পথ, হে নারী, আরও দুস্তর পথ এখনও তোমার সামনে। চরৈবেতি, চরৈবেতি!

নির্বিকার হাসে মহাকাল।

আজ ষোড়শ দিবস। না-ঘুম রাত কাটিয়ে সকাল থেকেই অস্থির কুন্তী। কী ঘটবে, কী ঘটতে চলেছে!

ঘর-বার, ঘর-বার। কোথাও কোন পায়ের শব্দ শুনলেই শিহরণঃ ঐ বুঝি দুয়ারে এসে দাঁড়াল পুত্ররা!

কিছু তণ্ডুল সঞ্চিত ছিল ভাণ্ডারে। সঞ্চয় করেই রেখেছিলেন

কুন্তী। যখনই হোক, যে-অবস্থাতেই হোক, আজ তাঁর সামনে এসে দাঁড়াবে পুত্ররা। হয়ত অভুক্ত, পরিশ্রান্ত। তাদের সামনে কিছু অন্ন যে ধরে দিতেই হবে ব্যাকুলা জননীকে। রন্ধনের উদ্যোগ শুরু করেন কুন্তী। সংগ্রহ করে আনেন শুকনো কাঠ। কিন্তু মন বসে না, মন বসে না। কী ঘটছে এখন স্বয়ংবর-সভায়? কর্ণ…সে কি এতক্ষণে…সেই তৃতীয় যুবক…আর অর্জুন, তাঁর অর্জুন…

অবশেষে, সেই অভ্রান্ত পদশব্দ! উৎকর্ণ কুন্তী উঠে দাঁড়ালেন। প্রাণপণে সংযত করার চেষ্টা করলেন নিজেকে।

দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ালেন জ্যেষ্ঠ যুধিষ্ঠির, পিছনে নকুল আর সহদেব। তিনজনেরই চোখেমুখে উত্তেজনার ঢল।

স্থিতধী যুধিষ্ঠিরও যেন আজ অস্থির, মাতা, দ্রৌপদীকে লাভ করেছে অর্জুন! অব্যর্থ শরসন্ধানে সে বিদ্ধ করেছে সেই দুরূহ লক্ষ্যবস্তু। দুর্যোধন, জরাসন্ধ, শিশুপাল, শল্য—সমস্ত রাজারাই যেখানে ব্যর্থ হয়েছেন, অর্জুন সেখানে লক্ষ্যভেদ করেছে অনায়াসে।

উত্তেজনায় যুধিষ্ঠিরের গলায় থরোথরো কাঁপন। নকুল-সহদেবও যেন অস্থির। পুত্রদের মুখগুলি নিরীক্ষণ করে শান্ত-কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন কুন্তী, আর কর্ণ?

উত্তর দিলেন নকুল, সে এক বিচিত্র ঘটনা, মাতা। অন্যান্য রাজাদের ব্যর্থতার পর ধনুতে জ্যা-রোপণ করেছিল কর্ণ। সবাই ভেবেছিল তার জয় অনিবার্য। কিন্তু যখন সে লক্ষ্যভেদ করতে উদ্যত, ঠিক তখনই স্বয়ং দ্রৌপদী বলে উঠলেন—আমি সূতপুত্রকে বরণ করব না। উদ্যত ধনুর্বাণ নামিয়ে রেখে সরে গেল কর্ণ।

যন্ত্রণার কোন অতলান্ত সাগর ফুঁসে উঠল কুন্তীর চেতনায়। এই তাহলে দ্রুপদ-উদ্ভাবিত সেই অমোঘ পন্থা? এই সেই নির্দয় সমাধান? সহস্র চক্ষুর সামনে আকাঙ্ক্ষিত নারীর কাছ থেকে এই অন্যায় প্রত্যাখ্যান? কিন্তু, কুন্তী নিজেও নারী। এক তীব্র আশঙ্কায় ছেয়ে যায় তাঁর নারীহৃদয়। এই প্রত্যাখ্যান কি দ্রৌপদীর

স্বেচ্ছাকৃত? ঐ রূপবান, ব্যক্তিত্বমণ্ডিত যথার্থ পুরুষটিকে প্রত্যাখ্যান করতে একবারও কি কেঁপে ওঠে নি তার বুক? পিতার নির্দেশে সে কি সম্মতা হয়েছে স্বেচ্ছায়, নাকি নিতান্ত অনিচ্ছায়, বাধ্য হয়ে? কুন্তীর রমণীহৃদয় আশঙ্কায় আলোড়িত। অস্ফুট কণ্ঠে তিনি বলে ওঠেন, সে কোন প্রতিবাদ করল না?

কে, কর্ণ? উত্তর দেয় কনিষ্ঠ সহদেব, না, শুধু কেমন-একটু হেসে ফিরে গেল নিজের জায়গায়, দুর্যোধনের পাশে।

হতভাগ্য! ওরে হতভাগ্য, এতটা পুরুষ তুই না হলেও পারতিস! জানি না, আমার পুত্রবধূ কোনদিন তোর ক্ষমা পাবে কি না।

কথাগুলো নিরুচ্চারই থাকে, মুখ লুকিয়ে পাথসাট খায় বুকের পাঁজরে। কুন্তীর মুখে ফোটে অন্য প্রশ্ন, আর সেই তৃতীয় জন? কে সে? কোন সন্ধান পেলে তার?

যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠস্বরে অসহায়ত্বের সুর, না মাতা। এই ষোলটা দিন ধরে অবিরাম চেষ্টা করেছি তাকে চিনে নেওয়ার। কিন্তু চিনতে পারি নি। ঐ অগণন মানুষের মধ্যে কে যে সেই পিতামহ-কথিত তৃতীয় যুবক, বুঝে উঠতে পারি নি।

উদ্‌গত দীর্ঘশ্বাসটা গোপন করলেন কুন্তী। এবং এতক্ষণে যেন সচকিতা হয়ে উঠলেন অন্য-এক আর্তিতে, তোমরা ফিরে এলে, কিন্তু ভীমসেন আর অর্জুন কোথায়? কোথায় দ্রৌপদী?

তারা আসছে, মাতা—যুধিষ্ঠির বলে ওঠেন—আমরা দেখে এসেছি মহারাজ দ্রুপদের অনুচররা পুষ্পবৃষ্টি করছে অর্জুনের মস্তকে, বাদ্যকররা তূর্য বাজাচ্ছে, স্তুতিপাঠ করছে সুকণ্ঠ সূত আর মাগধরা। আপনি উদ্বিগ্না হয়ে আছেন ভেবে নকুল-সহদেবকে নিয়ে আমি চলে এলাম আপনাকে সংবাদ দিতে।

আবার তিন পুত্রের মুখের দিকে তাকালেন কুন্তী। এইসব মুখ তাঁর অতি-চেনা, বহু বছরের পরিচিত। এইসব মুখের মানচিত্র তাঁর অন্তরস্থ। এতদিনের অভিজ্ঞতায় তাঁর এতটুকুও

অসুবিধে হয় না এইসব মুখের যে-কোন অপ্রকাশ আর্তি বুঝে নিতে।

বুঝেছেন কুন্তী। বেদব্যাসের রাজনৈতিক-মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা, তাঁর নিজের গোপনতম আকাঙ্ক্ষা ছাপিয়ে এখন আর-এক জ্বলন্ত সত্য তাঁর সামনে স্পষ্ট, স্পষ্ট তাঁর তিন পুত্রের উত্তেজিত মুখ-মণ্ডলের মানচিত্রেঃ পাঞ্চালতনয়ার জন্য ব্যাকুল এই তিন যুবক, পূর্ণযৌবনা দ্রৌপদী ঘৃতাহুতি দিয়েছে এই যুবকত্রয়ের কামনার আগুনে। না, একা অর্জুন আর পেতে পারে না তারই জয়লব্ধা সেই রমণীকে। কিন্তু এখনও, এই চরম মুহূর্তেও, কুন্তী জানেন না—কেমন করে সম্ভব হবে সেই অসম্ভব, কোথায় রয়েছে সমাধানের চাবিকাঠি।

ধীর পায়ে কুটিরের অভ্যন্তরে চলে গেলেন চিন্তাডুবো কুন্তী। আগুন জ্বাললেন। জ্বলে উঠল শুকনো কাঠ। রন্ধনে ব্যাপৃতা হলেন পাণ্ডবজননী।

খরচ হয়ে গেল অনেকটা সময়। এক-একটা পল যেন এক-একটা প্রহর। তারপর একসময় কুটিরের দ্বারপ্রান্ত থেকে ভেসে এল এক পরিচিত কণ্ঠস্বর, মাতা, দেখে যান, আজ ভিক্ষায় এক পরম রমণীয় বস্তু লাভ করেছি আমরা।

অর্জুনের কণ্ঠস্বর! আমূল কেঁপে উঠলেন কুন্তী। শিয়রে উপস্থিত সেই মহাক্ষণ। দুয়ারে এসে দাঁড়িয়েছে অর্জুন। এবং কুন্তী জানেন, কী সেই ভিক্ষালব্ধ রমণীয় বস্তু। দ্রৌপদী। দ্রৌপদীবিজেতা অর্জুন দ্বারপ্রান্ত থেকে আহ্বান জানাচ্ছে জননীকে।

চকিতে চেতনায় বিদ্যুৎচমক। এই মুহূর্তই অন্তিম মুহূর্ত, এই মুহূর্তেই অর্জুনজননীকে বপন করতে হবে ভবিষ্যতের বীজ। আর, এতক্ষণে উপায়টা চোখের সামনে স্পষ্ট দিনের আলোর মতো।

কুটিরের অভ্যন্তর থেকেই নিতান্ত নিস্পৃহ স্বরে, কিছু-না-বোঝা গলায় কুন্তী বললেন, যা এনেছো তা পাঁচজনে সমবেত হয়ে

ভোগ করো।

প্রবল বজ্রপাতে কি প্রকম্পিত হল ধরাতল? কেঁপে উঠলেন অর্জুন। নিজের অজান্তে এ কী অমোঘ বাক্য উচ্চারণ করলেন জননী?

কুটিরের অভ্যন্তর থেকে বাইরে বেরিয়ে এলেন কুন্তী। দুয়ারে দাঁড়িয়ে ভীমসেন, অর্জুন আর সেই নারীঃ দ্রৌপদী। সমস্ত শক্তি সংহত করে নিজেকে শক্ত রাখার চেষ্টা করলেন কুন্তী, ব্যাকুল কণ্ঠে বললেন, এ কী? তুমি যে বললে ভিক্ষা নিয়েএসেছ? হায় হায়, এ আমি কী করলাম।

অর্জুন নির্বাক, নিস্পন্দ। ভীমসেন বিমূঢ়। মাতৃবাক্য! মাতৃবাক্য অলঙ্ঘ্যনীয়। সজ্ঞানেই হোক আর অজান্তেই হোক, জননীর যে-কোন কথাকে বেদবাক্যের মতো দুর্লঙ্ঘ্য বলে বিশ্বাস করার, তা পালন করার শিক্ষাই এতদিন ধরে পেয়ে এসেছেন পাণ্ডবরা। আজ তার অন্যথা হবে কেমন করে? কুন্তীর ঐ কথাকটি যে অনড় আদেশ অর্জুনের কাছে। আর ঐ আদেশ পালন না করার অর্থ জননীকে মিথ্যাবাদিনীতে পরিণত করা! দুই পায়ের নীচে অথৈ শূন্যতা নিয়ে দাঁড়িয়ে থাকেন অর্জুন।

কুন্তী এগিয়ে গেলেন দ্রৌপদীর সামনে। নিজের হাতে তুলে নিলেন দ্রৌপদীর একটি হাত। সেই আশ্চর্য কোমল হাতেও যেন একটু কাঠিন্যের ছোঁয়া পেলেন কুন্তী, একটু যেন অনীহা, প্রতি-বাদ। কুন্তী থমকালেন না। এ প্রতিক্রিয়াটুকু প্রত্যাশিতই ছিল। দ্রৌপদীর হাত ধরে যুধিষ্ঠিরের কাছে এগিয়ে গেলেন তিনি। বললেন, বৎস, তোমার অনুজদ্বয় এই দ্রুপদনন্দিনীকে নিয়ে আমার সামনে ভিক্ষা এনেছি বলে উপস্থিত হয়। কিছু না দেখেই আমি আজ্ঞা করেছি—যা এনেছো তা পাঁচজনে সমবেত হয়ে ভোগ করো। বৎস, তুমি জ্ঞানী, ধর্মশাস্ত্রে তোমার অগাধ পাণ্ডিত্য। আমার বাক্যও যাতে মিথ্যা না হয় আর দ্রুপদনন্দিনীকেও যাতে কোন অধর্ম স্পর্শ করতে না পারে, তার যথাযথ ব্যবস্থা এখন তোমাকেই

করতে হবে।

না, একবারও উচ্চারণ করতে পারলেন না কুন্তী—আমার কথা আমি প্রত্যাহার করে নিচ্ছি। দুদিক রক্ষার দায়িত্ব তিনি তুলে দিলেন জ্যেষ্ঠ পুত্রটির ওপর। ফল কী হবে, তা-ও তাঁর অজানা ছিল না। যুধিষ্ঠির, নকুল, সহদেবের মনের পুঁথি তিনি পড়ে নিয়েছিলেন আগেই, এখন দেখেছেন ভীমসেনকেও। ভীমসেনের ব্যগ্র দৃষ্টি অস্থির ঘুরে বেড়াচ্ছে দ্রৌপদীর তনুলতায়।

শত প্রলোভন সত্ত্বেও, যুধিষ্ঠির জ্যেষ্ঠ, চিন্তাশীল। অনুজদের সামনে নিজের সুপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিরাবরণ করে মেলে ধরতে সংকোচ তাঁর স্বাভাবিক। জয়লব্ধা দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করার জন্য অর্জুনকে একবার অনুরোধ করলেন তিনি। সম্মত হলেন না অর্জুন। মাতার আদেশ লঙ্ঘন করতে তিনি অক্ষম। উচিত-অনুচিত নির্ধারণের ভার অগ্রজ যুধিষ্ঠিরের ওপরেই ছেড়ে দিলেন তিনি।

এবং তখন সিদ্ধান্ত ঘোষণা করলেন যুধিষ্ঠির—সেক্ষেত্রে দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই ভার্যা হবেন।

স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন কুন্তী। আহ্, এতদিনের উৎকণ্ঠার অবসান! অর্জুনের মনে কোন বঞ্চনার ছাপ পড়তে না দিয়েও তিনি পেরেছেন দ্রৌপদীকে পঞ্চস্বামীর পত্নীতে পরিণত করতে। সফল হয়েছেন তিনি। প্রতিপালিত হয়েছে বেদব্যাসের নির্দেশ, পূর্ণ হয়েছে তাঁর নিজের গোপন অভিলাষ, তৃপ্ত হয়েছে চার পুত্র, এবং অর্জুনও ঘটনাস্রোতকে মেনে নিয়েছে অনতিক্রম্য ভবিতব্য বলেই। কিন্তু, ঐ শ্যামাঙ্গী মেয়েটি? দ্রৌপদী? সে কি পারছে মেনে নিতে? বুঝে উঠতে পারছেন না কুন্তী। কিছু-একটা হয়ত বলতে যাচ্ছিলেন তিনি, কিন্তু ঠিক তখনই কুম্ভকারের কুটিরের সামনে এসে দাঁড়াল দুটি যুবক।

একজন অত্যন্ত স্বাস্থ্যবান। দেখলেই বোঝা যায় অমিত শক্তির অধিকারী। অন্যজন শ্যামবর্ণ, সুঠামদেহী, আশ্চর্য এক বুদ্ধির

দীপ্তিতে উজ্জ্বল দুটি চোখ। এই যুবকদ্বয়কে পঞ্চপাণ্ডব দেখেছেন স্বয়ংবর-সভায়। পরিচয়ও পেয়েছেন তাদের। অর্জুন দ্রৌপদীকে লাভ করার পর উত্তেজিত রাজন্যবর্গকে নিরস্তও করেছিল ঐ শ্যাম-বর্ণ যুবকটিই।

কুন্তীর সামনে এগিয়ে এল উজ্জ্বলনয়ন শ্যামবর্ণ যুবকটি, প্রণাম পিতৃষ্বসা।

প্রণাম জানাল স্বাস্থ্যবান যুবকটিও, প্রণাম পিতৃষ্বসা।

পিতৃষ্বসা? কুন্তী বিস্মিতা, কে তোমরা, বৎস? আমি তো তোমাদের চিনি না।

জানি পিতৃষ্বসা, বড় মিষ্টি করে হাসল শ্যামবর্ণ যুবকটি, আমার নাম কৃষ্ণ, উনি আমার অগ্রজ বলরাম। আপনার ভ্রাতা বসুদেব আমাদের পিতা।

ব-সু-দে-ব!

হ্যাঁ, শূরসেনতনয় বসুদেব কুন্তীর আপন ভ্রাতা। কিন্তু সেই পিত্রালয়ের কথা এতদিনে প্রায় বিস্মৃতই হয়েছেন কুন্তী। পিতা শূরসেন তাঁকে সমর্পণ করেছিলেন ভোজরাজ কুন্তিভোজের হাতে। আজ, এতদিন পরে, পিত্রালয় বলতে যে ছবিটা ভেসে ওঠে কুন্তীর চোখের সামনে, সে ঐ ভোজ পরিবারেরই ছবি। শূরসেন, বসুদেব, পৃথু-কীর্তি—সে-সব যেন হাজার বছর আগেকার কোন ক্ষীণ, অস্পষ্ট, প্রায়-মুছে-যাওয়া কয়েকটি নাম মাত্র। সেই বসুদেব, তার সন্তান, আর সেই সন্তান এই পাঞ্চালদেশে এখন তাঁর সামনে প্রণত। হ্যাঁ, জন্মসূত্রে এই কৃষ্ণ, ঐ বলরাম তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র, তাঁর নিকটাত্মীয়, বড় আপনার জন।

নিকটাত্মীয়! বড় আপনার জন! এক লহমায় চোখের সামনে গভীর কুয়াশায় আলোর সংকেত। বেদব্যাস বলেছিলেন, সেই তৃতীয় যুবক তোমার নিকটাত্মীয়, বড় আপনার জন। তাহলে, তাহলে এই কি সেই তৃতীয় যুবক? পঞ্চপাণ্ডবের ভবিষ্যতের রূপকার? কৃষ্ণ?

কুন্তী প্রশ্ন করলেন, কিন্তু আমরা যে জীবিত আছি, আমরা যে এখানেই আছি, সে সংবাদ তোমরা কোথায় পেলে ?

হাসলেন কৃষ্ণ, উপযুক্ত স্থান থেকেই সংবাদ পেয়েছি, পিতৃষ্বসা। কিন্তু তাঁর নামোল্লেখ আর না-ই বা করলাম। আপনার এবং আমার এই পঞ্চভ্রাতার পরমাত্মীয় তিনি—এইটুকু বললেই যথেষ্ট হবে। আপনারা জীবিত আছেন, আমি জানতাম। দ্রৌপদী যে অর্জুনেরই জয়লব্ধা হবেন, তা-ও অজানা ছিল না। শুধু জানতাম না পাঞ্চালনগরীর ঠিক কোথায় আশ্রয় নিয়েছেন আপনারা। তাই এখানে আসার জন্য গোপনে অনুসরণ করতে হল অর্জুন আর ভীমসেনকেই—বলতে বলতে উচ্চকণ্ঠে হেসে উঠলেন কৃষ্ণ—আমার ভ্রাতাদ্বয় কিন্তু জানতেও পারলেন না যে তাঁরা অনুসৃত হচ্ছেন।

না, আর কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। সেই অনুল্লেখিত পরমাত্মীয়টি কে, জানেন কুন্তী : বিদুর। বেদব্যাস জানিয়ে গিয়েছিলেন—সেই তৃতীয় যুবককে সংবাদ পাঠিয়েছেন বিদুর। আর সংশয় নেই, এই সেই তৃতীয় যুবক, পাণ্ডবদের ভবিষ্যতের রূপকার : বসুদেবতনয় কৃষ্ণ! কিন্তু এমন কী গুণের আকর এই যুবকের মধ্যে খুঁজে পেয়েছেন বেদব্যাস, যার ভিত্তিতে এত বড় একটা ভবিষ্যদ্বাণী করে গেলেন তিনি ? সতৃষ্ণনয়নে ভ্রাতুষ্পুত্রের দিকে তাকিয়ে কুন্তী বলেন, এসো বৎস, কুটিরে এসো।

না পিতৃষ্বসা, এই মুহূর্তে আমার বড় সময়াভাব। আজ আমি শুধু পরিচয়টুকুই করে গেলাম। ভবিষ্যতে……থাক, ভবিষ্যতের উত্তর ভবিষ্যৎ নিজেই দেবে। শুধু বলে যাই, আবার আসব আমি। এই পঞ্চভ্রাতার সঙ্গে আমার বন্ধন জীবদ্দশায় আর শিথিল হবে না কখনও।

পিতৃষ্বসাকে প্রণাম জানিয়ে চলে গেলেন কৃষ্ণ আর বলরাম। পঞ্চপুত্র এবং দ্রৌপদীসহ কুটিরে প্রবেশ করলেন বিহ্বলা কুন্তী। ভবিষ্যৎ জীবনের দু দুটি অপরিহার্য মানুষের সঙ্গে একই দিনে,

প্রায় একই সময়ে, পরিচয় ঘটল তাঁর : পুত্রবধূ দ্রৌপদী এবং ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণ।

দ্রৌপদীবিজেতা ব্রাহ্মণ সত্যিই অর্জুন কিনা, সে সংশয় ছিলই দ্রুপদের। ভীমার্জুনকে অনুসরণ করে তাঁর পুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন গোপনে দেখে এলেন পাণ্ডবদের আশ্রয়স্থল। অতঃপর দ্রুপদ তাঁর পুরোহিতকে পাঠালেন বিবাহপ্রস্তাব জানাতে। পুরোহিত যখন কথা বলছেন যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে, তখনই এসে উপস্থিত হলেন দ্রুপদপ্রেরিত এক রাজদূত। রাজদূত জানালেন, এখানে আর বিলম্ব করার কোন প্রয়োজন নেই। মহারাজ দ্রুপদ আপনাদের জন্য রাজকীয় রথ প্রেরণ করেছেন। আপনারা রাজভবনে চলুন।

পুরোহিতকে আগে পাঠিয়ে দিলেন যুধিষ্ঠির। তারপর একটি রথে জননী কুন্তী আর দ্রৌপদীকে তুলে দিয়ে নিজেরা উঠে বসলেন অন্য একটি রথে। আশ্রয়দাতা কুম্ভকারটি সবিস্ময়ে দেখল—তার এতদিনের আশ্রিত ভিক্ষান্নজীবী পাঁচ ব্রাহ্মণ আর তাদের জননী দেশের রাজকুমারীকে সঙ্গে নিয়ে রাজরথে চড়ে চলেছে রাজপ্রাসাদ অভিমুখে!

পুরোহিতের কাছে আগেই সংবাদ পেয়েছেন দ্রুপদ, স্বপ্ন সফল হয়েছে তাঁর। স্বয়ং তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুনই জয় করে নিয়ে গেছেন তাঁর কন্যাকে।

কুন্তীসহ পঞ্চপাণ্ডবকে স্বাগত জানালেন দ্রুপদ। উপহার হিসেবে প্রদান করলেন নানান ফল, পুষ্পমাল্য, বর্ম, গাভী, কৃষিবীজ, শিল্পদ্রব্য, ক্রীড়াসামগ্রী, অশ্ব, রথ, শর, শরাসন, বিবিধ অস্ত্র, রত্নময় শয্যা, মূল্যবান বসনভূষণ। দ্রৌপদীকে নিয়ে কুন্তী চলে গেলেন অন্তঃপুরে। মহার্ঘ আসনে উপবেশন করে সোনার থালায় রাজকীয় আহার্য গ্রহণ করলেন পাণ্ডবরা।

অতঃপর উত্থাপিত হল বৈবাহিক প্রশ্ন। ডেকে আনা হল কুন্তী এবং দ্রৌপদীকে। দ্রুপদ বললেন, আজ বড় শুভদিন। আমার

একান্ত ইচ্ছা আজই দ্রৌপদীর পাণিগ্রহণ করুন অর্জুন।

যুধিষ্ঠির উত্তর দিলেন, রাজন্, ভ্রাতাদের মধ্যে আমি জ্যেষ্ঠ। আমারও এবার বিবাহ করা কর্তব্য।

যুধিষ্ঠিরের মুখের দিকে তাকালেন দ্রুপদ। জামাতা হিসেবে যুধিষ্ঠিরকে পেলেও তাঁর আপত্তির কিছু নেই। কারণ যুধিষ্ঠির-কে জামাতা হিসেবে পাওয়া মানে যে-কোন প্রয়োজনে অর্জুনকেও পাশে পাওয়া। একটু হেসে দ্রুপদ বললেন, উত্তম, তাহলে আপনিই আমার কন্যার পাণিগ্রহণ করুন অথবা আপনার অন্য কোন ভ্রাতার সঙ্গে তার বিবাহ দিন।

মাথা নাড়লেন যুধিষ্ঠির, না মহারাজ, তা হওয়ার নয়। আমি এখনও দারপরিগ্রহ করি নি, ভীমসেনও এখনও অবিবাহিত। আমাদের জননী আদেশ দিয়েছেন দ্রৌপদী আমাদের সকলেরই মহিষী হবেন। অর্জুনই আপনার কন্যাকে জয় করেছেন, তা সত্য। কিন্তু আমাদের ভ্রাতাদের মধ্যে নিয়ম আছে যে কোন রত্ন পেলে তা আমরা সকলে মিলে ভোগ করে থাকি। সে নিয়ম আমরা লঙ্ঘন করতে পারব না, মহারাজ। আমাদের পঞ্চভ্রাতার সঙ্গেই বিবাহ হবে দ্রৌপদীর।

সচকিতে জ্যেষ্ঠের মুখের দিকে তাকালেন অর্জুন। আশ্চর্য, পরম সত্যবাদী হিসেবে যাঁর এত প্রসিদ্ধি, তিনি এমন অক্লেশে নির্জলা মিথ্যা উচ্চারণ করলেন কী করে? ভীমসেনকে অবিবাহিত বললেন যুধিষ্ঠির। কিন্তু সত্যের বিচারে ভীমসেন তো অবিবাহিত নন। অরণ্যের গভীরে সেই কালো মেয়ে হিড়িম্বার সঙ্গে বিবাহ হয়েছিল তাঁর। হিড়িম্বার গর্ভে জন্ম নিয়েছে তাঁর সন্তানও, নাম যার ঘটোৎকচ। তাছাড়া, কোন রত্ন প্রাপ্ত হলে তা সকলে মিলে ভোগ করার নিয়ম সত্যিই কি ছিল? তাহলে হিড়িম্বার ক্ষেত্রে তার ব্যতিক্রম ঘটল কেন? কেন সেই অরণ্যচর নারী অঙ্ক-শায়িনী হল না পঞ্চভ্রাতার? সংশয়ের একটা তীক্ষ্ণ কাঁটা ফুটে রইল অর্জুনের মাথায়। এ নিয়ম কি তাহলে শুধু দ্রৌপদীর

জন্যই? তার রূপ-যৌবন-মাদকতা……

দ্রুপদ স্তম্ভিত, ধৃষ্টদ্যুম্ন বাক্যহারা। এক পুরুষের বহু স্ত্রী থাকেই, কিন্তু এক নারীর বহু স্বামী? এ কি রীতিবিরুদ্ধ প্রস্তাব? বিশেষত জ্যেষ্ঠ ভ্রাতারা কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী-র সঙ্গে সহবাস করবেন, এ যে অতি গর্হিত আচরণ?

যুধিষ্ঠির অনড়। দ্রুপদ-ধৃষ্টদ্যুম্ন অসম্মত। সমস্যা ক্রমশ জটিল হয়ে উঠল। বিভ্রান্ত দ্রুপদ বললেন, আজ ভেবেচিন্তে আগামীকাল বরং সিদ্ধান্ত নেওয়া যাবে এ ব্যাপারে।

আর ঠিক এমনি সময় কক্ষের প্রবেশদ্বারে এসে দাঁড়ালেন সেই বৃদ্ধ, সর্বত্রগামী মানুষটি। ঠিক সময়ে ঠিক জায়গায় আবার দেখা দিয়েছেন কৃষ্ণদ্বৈপায়ন বেদব্যাস।

আশার আলো দেখলেন দ্রুপদ। মহাজ্ঞানী মানুষটি এসে গেছেন। আর চিন্তা নেই। যুধিষ্ঠিরের এই প্রথাবিরুদ্ধ প্রস্তাব নিশ্চয়ই মেনে নেবেন না তিনি।

বেদব্যাসের চরণবন্দনা করে দ্রুপদ বললেন, হে মহাত্মন্, এক নারী কি কখনও বহু পুরুষের পত্নী হতে পারে? আপনিই বলুন।

বেদব্যাস বুঝলেন, প্রশ্নটা উঠেছে। কিন্তু কীভাবে উঠেছে, অন্যদের কী মত—এখনও জানেন না তিনি। মৃদু হেসে বেদব্যাস বললেন, এ ব্যাপারে তোমাদের প্রত্যেকের মতটাই আগে শোনা যাক। আমার সিদ্ধান্ত পরে জানাব।

দ্রুপদ বললেন, না, এ নিতান্তই অধর্ম। পঞ্চস্বামীর সঙ্গে দ্রৌপদীর বিবাহে আমি সম্মতি দিতে পারছি না।

ধৃষ্টদ্যুম্ন স্পষ্টভাষী, না মহাত্মন্, এ বিবাহে আমি আদৌ সম্মত নই।

যুধিষ্ঠির জানালেন, আমি কখনও মিথ্যা বলি না, অধর্মকেও প্রশ্রয় দিই না। পুরাণে আছে জটিলা নাম্নী এক গৌতমবংশীয় কন্যা সাতজন ঋষিকে বিবাহ করেছিলেন। প্রচেতা নামক দশজন

ভ্রাতার সহধর্মিনী হয়েছিলেন বার্ক্ষি। তাছাড়া, শাস্ত্রে বলে, গুরু-জনদের আদেশ অলঙ্ঘনীয়। মাতা পরমগুরু। ভিক্ষালব্ধ সামগ্রী আমাদের সকলকে সমবেত হয়ে ভোগ করার আদেশ দিয়েছেন তিনি। তাঁর এ আদেশ আমরা লঙ্ঘন করতে পারি না কিছুতেই, কারণ জননীর আদেশ পালন করাই আমাদের কাছে পরমধর্ম।

এবং কুন্তী জানালেন সম্মতি – হ্যাঁ, যুধিষ্ঠির যা বলল, সে কথা আমি সত্য সত্যই বলেছি। মিথ্যাভাষণে বড় ভয় পাই আমি। এখন আপনিই বলুন মহাত্মন্, কী এর সমাধান ?

চোখমুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল বেদব্যাসের। বাহ্, চমৎকার একটি উপায় তাহলে উদ্ভাবন করতে পেরেছে কুন্তী : মাতৃআজ্ঞা! নিশ্চিন্ত হলেন বেদব্যাস। গভীর স্বরে বললেন, পুত্রী, তুমি যা বলেছ, তা-ই সনাতন ধর্ম। হে দ্রুপদ, যুধিষ্ঠির কোন অধর্মের কথা বলেন নি। দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামিত্বে কোন অন্যায় নেই।

স্বয়ং বেদব্যাসের এই উক্তির পর আর বাদানুবাদ চলতে পারে না। ধর্মের গতিপ্রকৃতি তাঁর থেকে বেশি করে আর কারই বা জানা আছে? দ্রুপদ শুধু বললেন, অদৃষ্টের ফল অখণ্ডনীয়। এতে ধর্মই হোক আর অধর্মই হোক, এ বিষয়ে আমার আর কোন দায়িত্ব রইল না। পঞ্চপাণ্ডবের সঙ্গেই বিবাহ হোক দ্রৌপদীর।

আর বিলম্ব করতে সম্মত নন বেদব্যাস। সেদিন চন্দ্রমা গমন করবে পুষ্যা নক্ষত্রে। শুভদিন। বেদব্যাসের নির্দেশে সেদিনই প্রথমে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে, পরে পর্যায়ক্রমে বাকি চার ভ্রাতার সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হলেন দ্রৌপদী। নিমন্ত্রিত হয়ে এল অসংখ্য কন্যাযাত্রী। জ্বলে উঠল পবিত্র অগ্নি, উচ্চারিত হল মন্ত্র, হুতাশনে প্রদত্ত হল আহুতি। অগ্নিপ্রদক্ষিণ করে দ্রৌপদী বরণ করে নিলেন পঞ্চস্বামীকে।

পঞ্চ জামাতাকে দ্রুপদ যৌতুক দিলেন বহু ধনসম্পদ, একশত হস্তী, একশত রথ আর একশত দাসী।

না, হস্তিনাপুরে সংবাদ পাঠানোর প্রস্তাব একবারও উচ্চারিত হল না কারও মুখে।

পুত্রবধূকে আশীর্বাদ করে কুন্তী বললেন, বৎসে, স্বামীদের ভক্তি কোরো, প্রণয়বতী হোয়ো। অযুত বৎসর পরমায়ু হোক তোমার। আজ যেভাবে তোমাকে আশীর্বাদ করলাম, আবার সেই-ভাবেই আশীর্বাদ করব যেদিন তুমি প্রসব করবে বীরপুত্র।

অবসান ঘটেছে কুন্তীর অপরাধবোধের। ইতিহাসের পৃষ্ঠায় তিনি আর বহুপুরুষের অংকশায়িনী শেষ নারী নন।

১০

সব কাজ সারা হল। এইবার ছুটি। আর কিছু করার নেই, ভাবার নেই। সারা জীবনের ক্লান্তিশেষে, অবশেষে অবসর।

যুধিষ্ঠির রাজা। কুন্তী রাজমাতা। সে অনেক দিনের কথা। গুপ্তচরের মুখে সংবাদ পেয়ে পাঞ্চালনগরী থেকে পান্ডবদের ফিরিয়ে এনেছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। পাঞ্চালে গিয়েছিলেন বিদুর, হয়ত দীর্ঘদিন সেই দুটি দীঘল আঁখির অদর্শনে উন্মুখ ছিলেন তিনি। পান্ডবরা হস্তিনায় ফিরে আসার পর রাজ্যকে দু'ভাগে ভাগ করে যুধিষ্ঠিরের হাতে ধৃতরাষ্ট্র তুলে দিয়েছিলেন খান্ডব-প্রস্থ। সুন্দর, রমণীয় খান্ডবপ্রস্থ। চারদিকে পরিখা, পাশে সু-উন্নত প্রাচীর। নগরীর অভ্যন্তরে অসংখ্য সৌধ, রাজপথ, মনোরম রাজপ্রাসাদ। আর অগণন গাছগাছালির মায়াতী ছায়া। তৃপ্ত হয়েছিলেন পঞ্চপান্ডব, তৃপ্ত হয়েছিলেন জননী কুন্তী। রাজ্যের নতুন নাম রাখা হয়েছিল ইন্দ্রপ্রস্থ। না-ই হোক হস্তিনাপুর, স্বপ্নের রাজসিংহাসনে তো অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন যুধিষ্ঠির। ইন্দ্রপ্রস্থের রাজা তিনি। কুন্তী রাজমাতা। সে আজ অনেক দিনের কথা।

সব কাজ সারা হয়েছে কুন্তীর। ধীরে ধীরে তিনি হয়ে উঠেছেন একেবারেই অন্তরালবর্তিনী। সত্যিই তিনি ইন্দ্রপ্রস্থে

আছেন কি নেই, তা-ও যেন অনেক সময় বুঝে উঠতে পারে না নগরবাসীরা। কোথাও দেখা যায় না তাঁকে। এখন শুধু নিজের জগতে, একান্তে, স্মৃতিচারণায় ডুব-ডুব খেলার প্রহর। অনন্ত অবসর।

তবু মাঝে-মাঝে দু'একটি সংবাদ ছুঁয়ে যায় কুন্তীকে। কখনও খুশির, কখনও বিষাদের। কৃষ্ণের সঙ্গে মৈত্রীবন্ধন দিনে দিনে পুষ্ট হয়েছে পঞ্চপুত্রের, পুত্রবধূ দ্রৌপদীর অন্তরঙ্গ সখায় পরিণত হয়েছেন কৃষ্ণ। খুশি হয়েছেন কুন্তী। ভ্রাতুষ্পুত্রটির অতীত গৌরবগাথার অনেক সংবাদই পেয়েছেন তিনি, প্রমাণ পেয়েছেন তার তীক্ষ্ম বুদ্ধিমত্তার। এমন এক আপনার জন আজ এসে দাঁড়িয়েছে তাঁর পঞ্চপুত্রের পাশে—ভাবতে ভাল লেগেছে কুন্তীর। দ্রৌপদী ছাড়াও অন্যান্য নারীদের সঙ্গে বিবাহ হয়েছে পুত্রদের। অখুশি হন নি কুন্তী।

পাশাপাশি ঘনিয়েছে বিষাদও। দ্রুপদ এখনও প্রতিশোধ-স্পৃহায় অটল। যুদ্ধই চাইছেন তিনি। কুন্তী বিষণ্ণা হয়েছেন। যুধিষ্ঠির—দ্রৌপদী একত্রে অবস্থান করার সময় সেই কক্ষে প্রবেশের প্রায়শ্চিত্ত করতে আবার বারটা বছর বনবাস করে এসেছেন অর্জুন। অর্জুনের এই যাত্রার পিছনে যে রাজনীতির ভূমিকা ছিলই, তা বুঝতে অসুবিধে হয় নি কুন্তীর। অস্ত্রবিদ্যার উন্নততর কলা-কৌশলের সঙ্গে পরিচিত হওয়া আর নতুন নতুন মিত্র সংগ্রহ করা —এ দুটো উদ্দেশ্য ছিলই অর্জুনের নিঃসঙ্গ যাত্রার। কিন্তু, আরও কিছু, আরও গোপন, ব্যথাসিক্ত,'কোন কারণও কি ছিল না? আপন কৃতিত্বে জয়লব্ধা নারীকে একান্ত নিজের করে না-পাওয়ার যন্ত্রণা যে দগ্ধ করেছে অর্জুনকে, বুঝেছিলেন কুন্তী। স্ব-উদ্ভাবিত অমোঘ কৌশলেও তিনি পুরোপুরি মুছিয়ে দিতে পারেন নি অর্জুনের জ্বালা। বনবাসে থাকার সময় নানা দেশে ঘুরে বেড়িয়েছেন অর্জুন। বিবাহ করেছেন নাগকন্যা উলূপীকে, মণিপুররাজ-দুহিতাকে চিত্রাঙ্গদার পাণিগ্রহণ করেজন্ম দিয়েছেন পুত্র বভ্রুবাহনের।

অবশেষে দ্বারকা থেকে কৃষ্ণভগিনী সুভদ্রাকে বিবাহ করে ফিরেছেন ইন্দ্রপ্রস্থে, সম্পর্কসূত্রে যে সুভদ্রা অর্জুনের মাতুলকন্যা। জন্ম হয়েছে অভিমন্যুর। খুশিই হয়েছেন কুন্তী। কোন-এক নারীকে একান্ত নিজের করে পেয়েছেন অর্জুন, কৃষ্ণের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতর হয়েছে তাঁর সম্পর্ক—সান্ত্বনা পেয়েছেন কুন্তী। দ্রৌপদীও জননী হয়েছেন পঞ্চপুত্রের। খাণ্ডববন দহন করে অর্জুন লাভ করেছেন অত্যাধুনিক ধনু গাণ্ডীব, কৃষ্ণ পেয়েছেন সুদর্শন চক্র। বিষাদ পেরিয়ে স্বস্তি ছুঁয়েছেন কুন্তী। কিন্তু আবার ফিরেছে বিষাদী মেঘ। যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞে ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণের হাতে নিহত হয়েছে ভগ্নী শ্রুতস্রবার পুত্র চেদিরাজ শিশুপাল। ভীমের হাতে প্রাণ দিয়েছেন মগধরাজ জরাসন্ধও।

এইসব দুঃখ-সুখের দোলা-দোলানো দিন-রাত্তির পেরিয়ে অনেকটা পথ এগিয়ে এসেছেন কুন্তী। ছুঁয়ে যায় দুঃখ, স্বাদ আসে সুখের। তবু, রাজমাতা কুন্তী এখন কেমন-যেন উদাসীন, পৃথিবীর যাবতীয় বর্ণে-গন্ধে আশ্চর্য নিস্পৃহ। হয়ত এখন নদীর বুকে সাগরে মেশার ডাক। কোন অপার্থিব জ্যোতির্ময় রথের আরোহিণী হয়ে কোন অচিনপুরীর পথে পাড়ি দেওয়ার হাতছানি।

কিন্তু সেদিন আবার ভাঙলো কঠিন প্রাচীর। এতদিন ধরে গড়ে তোলা ঔদাসীন্যের নাগপাশ ছিঁড়ে অস্থির হয়ে উঠলেন কুন্তী। পাশাখেলা? হস্তিনাপুরে শকুনির সঙ্গে পাশা খেলতে যাবেন যুধিষ্ঠির?

বিদুর এসেছেন। দুর্যোধনের অনুরোধে পাশাখেলায় সম্মতি দিয়েছেন ধৃতরাষ্ট্র। যুধিষ্ঠিরের কাছে পাশাখেলায় অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব পড়েছে বিদুরেরই ওপর। ইন্দ্র-প্রস্থে এসে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে কথা বলেছেন বিদুর। সম্মত হয়ে-ছেন যুধিষ্ঠির। যাবেন তিনি হস্তিনাপুর রাজসভায়, অংশ নেবেন

শকুনির সঙ্গে পাশাখেলায়।

যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে আলোচনা সমাপন করে বিদুর এসেছেন কুন্তীর কক্ষে। শুনেছেন কুন্তী। শিহরিতা হয়েছেন, শঙ্কিতা হয়েছেন। পাশা অতি সর্বনেশে খেলা, যুধিষ্ঠির তাতে অত্যন্ত আসক্ত আর প্রতিপক্ষ অপ্রতিদ্বন্দ্বী অক্ষবিদ শকুনি স্বয়ং। পরাজয় অবধারিত যুধিষ্ঠিরের। কী কী পণ রাখবে সে, হারিয়ে আসবে কোন্ কোন্ সম্পদ—ভেবে পান না কুন্তী। কী প্রয়োজন ছিল এ প্রস্তাবে সম্মত হওয়ার। আর—

ভাবতে গিয়ে করুণ হাসি ফোটে কুন্তীর ঠোঁটে, বিদুর, এত-বড় একটা সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে আমার অনুমতিটুকু নেওয়ারও প্রয়োজন বোধ করল না যুধিষ্ঠির ?

বিদুর নির্বাক। দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন কুন্তী, প্রাণাধিক পুত্রদের জীবনেও একসময় বোধহয় জননীর প্রয়োজন শেষ হয়েই যায়, তাই না বিদুর ?

মুখ তুললেন না বিদুর। খুব নীচু গলায় বললেন, ঠিক জানি না আর্যে, হয়ত তা-ই যায়। তবে কারুর কারুর জীবনে বিশেষ কারুর প্রয়োজন অন্তিম মুহূর্ত পর্যন্তও শেষ হয় না।

সেই বিদুর। সেই প্রথমদিনের দেখা দুটি আয়ত চোখের নীলচে আভা। কত কত বছর, কত কত পথ পার হয়ে এসে, জীবনের এই প্রান্তভাগেও, বিদুর নিষ্কম্প, একমাত্র আকাশপ্রদীপ।

চলে গেলেন বিদুর। রথে চড়ে হস্তিনাপুর অভিমুখে যাত্রা করলেন পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী আর পাণ্ডবভ্রাতাদের অন্যান্য মহিষীরা। অলিন্দে একাকিনী দাঁড়িয়ে নির্বাক দেখলেন কুন্তী। যন্ত্রণা ? আজও ? হায় স্বপ্নসম্ভব আত্মজরা আমার! আজ আর প্রয়োজন হয় না আমার অনুমতিটুকুও। গান্ধারী কিন্তু আজও এতটা উপেক্ষিতা নন, হস্তিনাপুরে আজও গুরুত্ব পায় তাঁর মতামত। তার কারণ কি এই যে হস্তিনাপুরের শাসক গান্ধারীর স্বামী আর ইন্দ্রপ্রস্থের শাসক আমার পুত্র ? স্বামীর ওপর যতটা

অধিকার থাকে নারীর, ততটা কি থাকে না আপন রক্তমাংসে গড়ে তোলা পুত্রদের ওপর ?

উত্তর খুঁজে পান না কুন্তী। শুধু আরও অধিক বিস্ময়ে ভাবতে চেষ্টা করেন—পঞ্চভ্রাতা না-হয় গেলই হস্তিনাপুরে, কিন্তু কি প্রয়োজন ছিল দ্রৌপদী বা অন্যান্য মহিষীদের নিয়ে যাওয়ার ? আশ্চর্য, সে ব্যাপারেও তাঁর মতামত চায় নি কেউ, এমনকি পুত্র-বধূরাও নয় !

সব-হারানোর আর্তি আর দুরন্ত ক্রোধ নিয়ে ফিরলেন পাণ্ডবরা। দ্রৌপদীর চোখ জুড়ে ধূ-ধূ মরুভূমি।

নিজেকে আর সংবরণ করতে পারলেন না কুন্তী, সরে থাকতে পারলেন না অভিমানে। ছুটে এলেন। শীর্ণ দুটি বাহু প্রসারিত করে নিরাপত্তা দিতে চাইলেন পুত্রদের। ব্যাকুলকণ্ঠে শুধোলেন, কী হয়েছে ?

তারপর একটু একটু করে শুনলেন সব। পাশার পণে একে একে সব হারিয়েছিলেন যুধিষ্ঠির। ধনসম্পদ, রাজ্য, চার ভ্রাতা, এমনকি নিজেকে পর্যন্ত। সবশেষে বাজি ধরেছিলেন দ্রৌপদীকে এবং কুশলী শকুনি জিতে নিয়েছিলেন সেই শেষ বাজিটিও। কৌরবদের দাসে পরিণত হয়েছিল পাণ্ডবরা। দ্রৌপদীর কেশা-কর্ষণ করে তাকে কৌরবসভায় টেনে এনেছিল দুঃশাসন। একমাত্র বিদুর আর ধৃতরাষ্ট্রপুত্র বিকর্ণ ছাড়া সমস্ত রাজসভা বসেছিল মৌন দর্শক হয়ে। দ্রৌপদীকে বারাঙ্গনা বলে চিহ্নিত করেছিলেন কর্ণ, দুঃশাসনকে নির্দেশ দিয়েছিলেন দ্রৌপদীকে সর্বসমক্ষে বিবসনা করার। এগিয়েছিল লোলুপ দুঃশাসন, আকর্ষণ করেছিল কুরুকুলবধূর বসনপ্রান্ত। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নিরুত্তাপ মুখের দিকে তাকিয়ে নিশ্চল বসেছিলেন তিন অনুজ পাণ্ডব। শুধু ভীম, চির-দুর্বিনীত ভীমসেন, গর্জন করে বলে উঠেছিলেন, দুঃশাসন, এই কৌরবসভায় দাঁড়িয়ে আমি শপথ করছি—যুদ্ধে তোর বুকের

রক্ত পান করে এর প্রতিশোধ নেব আমি। কেঁপে উঠেছিল দুঃশাসন, দ্রৌপদীকে ছেড়ে ফিরে গিয়েছিল নিজের জায়গায়। সহস্র চক্ষুর সামনে সম্পূর্ণ বিবসনা হওয়ার লজ্জা থেকে রেহাই পেয়েছিলেন দ্রৌপদী। কিন্তু লাঞ্ছনার শেষ হয় নি সেখানেও। কর্ণ বলেছিলেন—দ্রৌপদী, তুমি এখন ঐ পঞ্চভ্রাতাকে পরিত্যাগ করে অন্য কোন পুরুষকে পতিত্বে বরণ করো।

শেষপর্যন্ত এসে দাঁড়িয়েছিলেন বদ্ধনেত্রা গান্ধারী। তাঁর অনুরোধে ধৃতরাষ্ট্র মুক্তি দিয়েছেন পঞ্চপাণ্ডব আর দ্রৌপদীকে, ফিরিয়ে দিয়েছেন পাশায় বিজিত যাবতীয় ধনসম্পদ। হ্যাঁ, গান্ধারীর কথা যে এখনও অন্তত কিছুটা মূল্য পায় হস্তিনাপুরে, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ তিনি রেখেছেন।

সব শুনেছেন, কিন্তু কোন সান্ত্বনার বাক্য উচ্চারিত হয় নি রাজমাতা কুন্তীর মুখে। চুপচাপ আপন কক্ষে ফিরে গেছেন। এতদিনের উদাসীন বুক জুড়ে শুধু ঢেউ তুলেছে অভিমান আর জ্বালা আর এক তীব্র ক্রোধ। বারবার চোখের সামনে ভেসে উঠেছে একটি মুখ, যে মুখের কথা ভেবে উথলে ওঠে তাঁর ভাল-বাসা, থমকে যায় শ্বাস। এইভাবে প্রতিশোধ নিল কর্ণ? পাঞ্চাল রাজসভায় দ্রৌপদীর চরম অপমানের উত্তরে অবজ্ঞার হাসি হেসে যে নিজেকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল পৌরুষের উত্তুঙ্গ শিখরে, সে আজ প্রতিশোধের স্পৃহায় উন্মাদ হয়ে নেমে গেল নীচতার চরম রসাতলে? লক্ষ চোখের সামনে সেই নির্মম প্রত্যাখ্যানের প্রতি-ক্রিয়ায় প্রতিশোধের দুর্বার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠা যে একান্তই স্বাভাবিক, তা বোঝেন কুন্তী, সমস্ত অন্তর দিয়েই বোঝেন। কিন্তু কর্ণ, তুমি তো পুরুষ, নির্মেদ পৌরুষে দৃপ্ত পুরুষের-মতো-পুরুষ। তুমি কী করে নামলে এতটা নীচে? এক অসহায়া নারীকে অজস্র লুব্ধ চোখের সামনে নগ্ন করার নির্দেশ দিতে এতটুকু সংকোচ হল না তোমার, এতটুকু লজ্জাও ছায়া ফেলল না তোমার মনে?

ভাবতে ভাবতে এক তীব্র ক্রোধ ছড়িয়ে পড়ে কুন্তীর চেতনায়। এর প্রতিফল তোমাকে ভোগ করতেই হবে কর্ণ, ভয়ংকর প্রতিফল। এ পৃথিবী কাউকে রেহাই দেয় না।

তারই মাঝে অভিমান, তারই ফাঁকে জ্বালা। পঞ্চপুত্রের কাছে আজ তিনি প্রায়-মূল্যহীন একটি অস্তিত্ব মাত্র। পাশা খেলতে যাওয়ার আগে তাঁর মতামত যদি চাইত পুত্ররা, তাহলে এ অঘটন ঘটার কোন সুযোগ থাকত কি?

আহ্, আবার, আবার সেই একই উপেক্ষা, একই মূল্যহীনতা।

দুর্যোধনের আহ্বানে আবার পাশাখেলায় যোগ দিতে হস্তিনাপুরে গেলেন যুধিষ্ঠির। এবারের পণ বড় ভয়ংকর: যে পক্ষ পরাজিত হবে, তাদেরকে যেতে হবে বার বছরের বনবাস আর এক বছরের অজ্ঞাতবাসে। না, এই ভয়ংকর ভাগ্যপরীক্ষার আগেও জননীর অনুমতি নিতে এলেন না যুধিষ্ঠির। হয়ত এক অপ্রতিরোধ্য লোভে আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি। যদি জয় আসে এবারের পরীক্ষায়, তাহলে বনবাসী হতে হবে দুর্যোধনদের। সাধের হস্তিনাপুরে প্রসারিত হবে যুধিষ্ঠিরের অধিকার। কিন্তু প্রতিপক্ষ যেখানে স্বয়ং শকুনি, সেখানে অক্ষক্রীড়ার বিজয়লক্ষ্মী তো ধরা দিতে পারেন না যুধিষ্ঠিরের হাতে! পরাজিত হলেন যুধিষ্ঠির।

অভিমানের সমুদ্র মন্থন করে উঠে এল হাহাকারের হলাহল। আবার বনবাস, আবার সেই সুকঠিন জীবন। ওরে দুর্ভাগার দল, তোদের নিয়ে এ কী নিষ্ঠুর খেলা নিয়তির! হাহাকারে ভেঙে পড়েন কুন্তী।

পঞ্চপাণ্ডব যাবেন বনবাসে। সঙ্গে যাবেন দ্রৌপদী। পাণ্ডব ভ্রাতাদের অন্যান্য ভার্যারা সন্তানদের নিয়ে চলে গেলেন যে-যার পিত্রালয়ে। অভিমন্যু মাতুলালয় দ্বারকাতেই ছিল। দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্রকেও এখন পাঠিয়ে দেওয়া হল মাতুলালয় পাঞ্চালে। ইন্দ্রপ্রস্থ শূন্য।

তাহলে ? পুত্র, পুত্রবধূ, এমনকি পৌত্রদেরও ছেড়ে, কার কাছে থাকবেন একাকিনী কুন্তী ? কাকে নিয়ে ? নাকি পণের শর্ত অনুযায়ী তাঁকেও হতে হবে পুত্রদের সহগামিনী, যেতে হবে বনবাসে ?

এই প্রথম, এতদিনে এই প্রথম, সর্বসমক্ষে স্পষ্টভাবে মুখ খুললেন বিদুর—আর্যা কুন্তী রাজপুত্রী। আজ তিনি বৃদ্ধা হয়েছেন। বনবাসের কঠোর কষ্ট সহ্য করার সামর্থ্য আর নেই তাঁর। তিনি বনগমন করবেন না। পুত্ররা ফিরে না-আসা পর্যন্ত আমার আবাসেই বসবাস করবেন তিনি।

অশ্রুঝরা আঁখিদুটি তুলে বিদুরকে দেখলেন কুন্তী। বৃদ্ধ হয়েছেন বিদুরও। সর্বগ্রাসী বার্ধক্যথাবা বসিয়েছে তাঁর শরীরেও। তবু ঐ বৃদ্ধ মানুষটির চেতন-অবচেতন জুড়ে আজও কুন্তীকে ঘিরে রাখার কি প্রবল আকাঙ্ক্ষা!

এগিয়ে এসে প্রণাম করলেন দ্রৌপদী। অনেক কষ্টে কুন্তী উচ্চারণ করলেন, বৎসে, এই দুঃখ-পারাবারের সামনে দাঁড়িয়েও শোক কোরো না। স্বামীদের যত্ন কোরো। জেনো, আবার সুখের দিন আসবে তোমাদের জীবনে। আর, সহদেব সর্বকনিষ্ঠ। তার দিকে একটু বিশেষ দৃষ্টি দিয়ো।

চলে যাচ্ছেন দ্রৌপদী, চলে যাচ্ছেন পঞ্চপাণ্ডব। ঐ দূরে পথের বাঁকে মিলিয়ে যাচ্ছেন তাঁরা। এখন তেরোটা বছর ঐ-সব প্রিয়-মুখ আর দেখতে পাবেন না কুন্তী, অংশীদার হতে পারবেন না তাদের দুঃখ-বেদনা-যন্ত্রণার।

ভাগ্যদোষ! আমারই ভাগ্যদোষ! আমারই গর্ভে জন্ম নেওয়ার ক্ষমাহীন অপরাধের মূল্য দিল ওরা। হায় হতভাগিনী। ধিক, ধিক পাপীয়সী! জীবনভোর বনবাসই যদি পুত্রদের একমাত্র নিয়তি হয়, তাহলে স্বামীর মৃত্যুর পর কেন ফিরে এলাম হস্তিনাপুরে ? রাজমাতা হওয়ার অদম্য প্রলোভন কেন জেগে উঠল আমার গভীরে ? ধন্য, মাদ্রী, তুমি ধন্য। পুত্রদের এই সর্বস্ব খোয়ানো

মুখগুলো দেখতে হল না তোমাকে। ধন্য তুমি। আর্যপুত্র, অনেক দূর থেকে কি আপনি এখন দেখতে পাচ্ছেন আপনার এই পরপুরুষগামিনী ভার্যার অশ্রুভাসা আঁখি দুটি? কৃষ্ণ, ভ্রাতুষ্পুত্র মোর, হে আমার পুত্রদের ভবিষ্যতের রূপকার, কোথায় তুমি? আর কত দূরে সে ভবিষ্যৎ? কত? কত? আর কত?

তখন কোথাও পাখি ডাকে নি। হাওয়ারা ফেরার। সূর্যদেবের মুখ ঢেকেছে কালোবরণ মেঘ। শুধু কোথাও গহীন কোন গাঙের জলে নিরন্তর এক ছলাৎ-ছল, ছলাৎ-ছল। ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎ। বাদ্যি বাজে ভবিষ্যতের।

১১

বিগত কয়েকদিন ধরেই এক ক্ষীণ স্মৃতি আর প্রত্যাশা আর উৎকণ্ঠার জাগরণ কুন্তীর মন-অতলে। হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদে সশিষ্য আতিথ্য নিয়েছেন ঋষি দুর্বাসা।

দু-র্বা-সা! সেই কোন্, বুঝি-বা লক্ষ বছর আগে ফেলে-আসা কিশোরী জীবনে কুন্তীর কুমারীতনুলতায় প্রথম পারিজাত-খুঁজে-নেওয়া সেই পুরুষ। যাঁর আগমনের ফসল ঘুমিয়ে আছে অশ্বনদীর গভীরে, যাঁর অভিজ্ঞানের দূরপ্রসারী যোগাযোগে পৃথিবীর আলো দেখেছে পঞ্চপাণ্ডব। সেই দুর্বাসা। হস্তিনাপুরে। দুর্যোধনের আশ্রয়ে। মানমর্যাদা বিসর্জন দিয়ে তাঁর সেবা করছে দুর্যোধন, জানিয়েছেন বিদুর। প্রতিদানে, কিছুই কি দিয়ে যাবেন না দুর্বাসা?

বাতায়নের সামনে দাঁড়িয়েছিলেন কুন্তী। প্রত্যাশা : জীবনের প্রথম পুরুষটিকে যদি দেখা যায় একবার। উৎকণ্ঠা : সেবার প্রতিদানে দুর্যোধনকে কী বর দিয়ে যাবেন তিনি?

বিদুর এসে দাঁড়ালেন, আর্যে।

ঘুরে দাঁড়ালেন উৎকণ্ঠিতা কুন্তী, কী সংবাদ, বিদুর?

সংবাদ অতি অশুভ, আর্যে। দুর্যোধনের অনুরোধে বনবাসী

পান্ডবদের আতিথ্য গ্রহণের অঙ্গীকার করেছেন ঋষি দুর্বাসা। অসংখ্য শিষ্যসহ এখনই যাত্রা করবেন তিনি। আর সেইসঙ্গেই দুর্যোধন অনুরোধ করেছে পঞ্চপান্ডব এবং দ্রৌপদীর আহার সমাপন হওয়ার পর যেন তাঁদের কাছে গমন করেন দুর্বাসা। তাতেও তিনি স্বীকৃত হয়েছেন।

একটু-যেন বিপন্না বোধ করেন কুন্তী। দুর্যোধনের এই বর প্রার্থনার তাৎপর্যটা ঠিক স্পষ্ট হয় না তাঁর কাছে। কণ্ঠস্বরে ফুটে ওঠে অবুঝ জিজ্ঞাসা, এ সংবাদকে অশুভ বলছ কেন, বিদুর।

বুঝলেন না, আর্যে? পঞ্চপান্ডব এবং দ্রৌপদীর আহার সমাপনান্তে যদি এই অসংখ্য শিষ্যসহ তাদের আতিথ্যগ্রহণ করেন দুর্বাসা, তাহলে সেই অসময়ে এত অতিথির জন্য তৎক্ষণাৎ কোথা থেকে অন্নসংস্থান করবে তারা? এমনিতেই দুর্বাসা উগ্রচন্ডা, তার ওপর আতিথ্য গ্রহণ করার পর আহার্য না পেলে তিনি কতটা ক্রুদ্ধ হবেন, অনুমান করতে পারছেন, আর্যে? ক্রুদ্ধ ঋষি চরম অভিশাপ দেবেন পান্ডবদের।

অভিশাপ? ঋষির অভিশাপ? কুন্তীর স্মৃতির সঞ্চয় মথিত করে জেগে ওঠে এক অতীত অভিশাপের অমোঘ পরিণতি: কিমিন্দম্, পান্ডু, অভিশাপ, এবং···

বিদুর, বিদুর—তীব্র আকুতিতে কুন্তীর কণ্ঠস্বর কম্পমান—দুর্বাসা যাত্রা করার আগেই তাঁকে একবার আমন্ত্রণ জানাও এখানে। এই মুহূর্তে।

এখানে, আর্যে? বিদুর বিস্মিত।

আহ্, বিদুর, বিলম্ব কোরো না!

দ্রুত পায়ে বেরিয়ে যান বিভ্রান্ত বিদুর। কক্ষের মধ্যে অস্থির কুন্তী পল গোণেন অধীর প্রতীক্ষায়।

একসময় দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়ান বিদুর—উনি এসেছেন, আর্যে।

আসতে বলো ওনাকে।

কক্ষে প্রবেশ করেন ঋষি দুর্বাসা। কত অমেয় বছর পার হয়ে, কুন্তীর চোখের সামনে তাঁর জীবনের প্রথম পুরুষটি এসে দাঁড়িয়েছেন ভিন্ন পটভূমিতে। না, বর্ণের সেই ঔজ্জ্বল্য আর নেই, শরীর আর সুঠাম নয়। বৃদ্ধ, লোলচর্ম, শুধু ডিঙিনৌকোর মতো দুটি চোখে আজও সেই অন্তর্ভেদী দৃষ্টির প্রজ্বলন, যদিও ক্ষীণ, নিষ্প্রভ।

এগিয়ে গিয়ে প্রণাম করেন কুন্তী। দক্ষিণ হস্তটি প্রসারিত করে আশীর্বাদ করেন দুর্বাসা, সৌভাগ্যবতী হও, বৎসে।

বৎসে! শিহরিতা কুন্তী আর্তনাদ করে ওঠেন, না মুনিবর, ঐ সম্বোধনে সম্বোধিত করবেন না আমায়!

ললাটে কুঞ্চনরেখা জাগে দুর্বাসার, অর্থাৎ?

মুনিবর, আমি কুন্তী!

জানি, তুমি পাণ্ডবজননী কুন্তী।

মুনিবর, আমি পৃথা।

কে পৃথা?

হায় পুরুষ! হায় পারিজাত হরণকারী প্রথম দস্যু আমার! সেদিনের অনাঘ্রাতা কিশোরীটির অস্তিত্ব জুড়ে মহাসমুদ্রের প্রথম গর্জন জাগিয়ে, তাকে অশ্বনদীর তাথৈ স্রোতের প্রান্তভাগে টেনে নিয়ে গিয়ে, আজ প্রশ্ন—কে পৃথা?

বলা যায় না, তবু বলতেই হয়, নারীত্বের যাবতীয় সংকোচ ছুঁড়ে ফেলে বিস্মৃতির আঁধারে আলো জ্বালতে হয় কুন্তীকে—স্মরণ করুন মুনিবর, বহু বছর আগে একবার আপনি আতিথ্য নিয়েছিলেন মহারাজ কুন্তিভোজের আলয়ে। সেখানে এক কিশোরী কন্যা পরিচর্যা করেছিল আপনার।

কুন্তিভোজ? এক কিশোরী? পরিচর্যা? হ্যাঁ, সেই···কী-যেন, কী-যেন এক ছবি, প্রায়-হারানো, রঙছুট, ভাসছে চোখে··· সেই কিশোরী, এক রাত্রি, কোমল শয্যা···কী-যেন নাম, কী-যেন···

তীব্র কণ্ঠে প্রশ্ন করেন দুর্বাসা, কী নাম বললে তোমার?

পৃথা। কুন্তী।

হ্যাঁ, সেই সমাজ-সংসার-পলাতক রাত্রে শিরায় শিরায় বহমান উষ্ণ স্রোতকে প্রশান্ত করেছিল যে কিশোরী, তার নাম…হ্যাঁ, মনে পড়ছে, মনে পড়ছে…পৃথা…কুন্তী…

তুমি…সেই কুন্তী? প্রবল বিস্ময়ে দুর্বাসার স্বর প্রায়-অস্ফুট।

হ্যাঁ মুনিবর, আমিই সেই কুন্তী, আজকের পাণ্ডবজননী। মনে পড়েছে, মুনিবর?

একটু কি লজ্জিত হন দুর্বাসা? বলেন, পড়েছে কুন্তী, মনে পড়েছে। দীর্ঘদিনের অদর্শনে বিস্মৃতই হয়েছিলাম সে ঘটনার কথা। বলো কুন্তী, কেন আমাকে আহ্বান জানিয়েছ আজ? কী তোমার প্রার্থনা? আমার সাধ্যের মধ্যে হলে অবশ্যই তা পূরণ করব আমি।

সাফল্যের ঘ্রাণ পাচ্ছেন কুন্তী, মুনিবর, বৎস দুর্যোধনের অনুরোধে আজ আপনি অরণ্যে চলেছেন আমার পুত্রদের আতিথ্য গ্রহণ করতে।

হ্যাঁ কুন্তী। দুর্যোধনের সেবায় পরিতুষ্ট হয়ে তার অনুরোধে সম্মত হয়েছি আমি।

আমার পুত্রদের আহার সমাপনান্তে তাদের আতিথ্য গ্রহণের অনুরোধ করেছে দুর্যোধন, তাই না মুনিবর?

তুমি সঠিক সংবাদই অবগত হয়েছ, কুন্তী।

কুন্তীর গলায় কিঞ্চিৎ কাঠিন্যের ছোঁয়া, কিন্তু তাদের আহার সমাপনান্তে সশিষ্য আপনি উপস্থিত হলে তারা তো আপনাদের আহার্যের সংস্থান করতে পারবে না, মুনিবর। সেক্ষেত্রে ক্রুদ্ধ হবেন আপনি, ক্রুদ্ধ হবেন আপনার শিষ্যরাও। সেই ক্রোধে হয়ত কঠোর অভিসম্পাত করবেন আমার পুত্রদের। সত্য বলছি, মুনিবর?

দুর্বাসা বিভ্রান্ত, অসহায়—কিন্তু আমি যে দুর্যোধনকে প্রতি-

শ্রুতি দিয়েছি, কুন্তী!

প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অনুরোধ আমি আপনাকে করব না– বৃন্ধা কুন্তীর মুখ জুড়ে কিশোরী পৃথার ভুবনভোলানো হাসি—শুধু মনে রাখতে বলব আরেকটি তথ্য। ইচ্ছামতো দেবতাদের আহ্বান করার জন্য আমাকে একটি অভিজ্ঞান দিয়েছিলেন আপনি, একটি বিশেষ কুণ্ডল। মুনিবর, আপনার সেই অভিজ্ঞানের সাহায্যেই আমি এবং আমার সপত্নী মাদ্রী আহ্বান করেছিলাম দেবতাদের। আজকের এই পঞ্চপাণ্ডব আমাদের সেই দেব-আহ্বানেরই আকাঙ্ক্ষিত ফল। সেই বিচারে, এই পঞ্চপুত্র তো আপনারই দান, মুনিবর! আজ এগার বছর বনবাসী আমার পুত্ররা। এদেরকে অভিসম্পাতে জর্জরিত করতে, সম্মতি দেবে কি আপনার বিবেক?

দীর্ঘক্ষণ নির্বাক বসে থাকেন দুর্বাসা। তারপর একসময় উঠে দাঁড়ান ধীরে ধীরে। কোমল অথচ স্পষ্টকণ্ঠে বলেন, দুর্যোধনকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি আমি ভঙ্গ করব না, কিন্তু তোমার আবেদন প্রত্যাখ্যানের শক্তিও আমার নেই, কুন্তী। নিশ্চিন্ত থাকো, কোন অনিষ্ট ঘটবে না তোমার পুত্রদের। আশীর্বাদ করি, কল্যাণ হোক তোমার।

চলে গেলেন দুর্বাসা। কিন্তু একবারও জানতে চাইলেন না জীবনের সেই প্রথম মিলনে কোন সন্তান এসেছিল কিনা কুন্তীর গর্ভে। হায় পুরুষ!

কয়েকদিন পর সংবাদ পেলেন কুন্তী, গভীর অরণ্যে যুধিষ্ঠিরের আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন সশিষ্য দুর্বাসা। আহার সমাপন করে তখন বিশ্রাম নিচ্ছিলেন পঞ্চভ্রাতা আর দ্রৌপদী। অসংখ্য শিষ্যে পরিবৃত উগ্রচণ্ডা ঋষি দুর্বাসাকে দেখে ব্যাকুল হয়েছিলেন যুধিষ্ঠির। স্নান-আহ্নিক সেরে আসার জন্য নদীতীরে গিয়েছিলেন দুর্বাসা। স্নানান্তে নদীতীরে আগত ভীমসেনকে বলেছিলেন, বৎস, জানি না কোন্ মন্ত্রবলে সহসা আমাদের সমস্ত ক্ষুধা

দূরীভূত হয়েছে। যুধিষ্ঠিরকে বোলো, তিনি যেন ক্ষুব্ধ না হন আমাদের ওপর। কল্যাণ হোক তোমাদের।

আর ফেরেন নি দুর্বাসা। শিষ্যদের নিয়ে এগিয়ে গিয়েছিলেন বনপথে, কোন অন্য গন্তব্যে। দুর্যোধনকে দেওয়া প্রতিশ্রুতি এবং কুন্তীর অনুরোধ, দু'দিকই রক্ষা করেছেন ঋষি দুর্বাসা।

কিন্তু, হিসেব যে মেলে না কিছুতেই। দুর্বাসার হাত থেকে রক্ষা করলেও, আর-একজনের হাত থেকে কিভাবে রক্ষা পাবে পুত্ররা?

পুত্রদের এই এগার বছরের বনবাসে বিদুরের আশ্রয়ে বসে বৃদ্ধা নারীটি হিসেব মেলাতে চেষ্টা করেছেন নানা দিক থেকে। তিনি জানেন, বেদব্যাস আজও নিয়মিত যোগাযোগ রাখেন তাঁর পুত্রদের সঙ্গে। জানেন, ভ্রাতুষ্পুত্র কৃষ্ণর সঙ্গে পাণ্ডবদের সম্পর্ক এখন অতি ঘনিষ্ঠ। সংবাদ পেয়েছেন, অস্ত্রবিদ্যায় আরও উন্নত হওয়ার জন্য বনবাসের এই এগার বছরের মধ্যে পাঁচ বছর অর্জুন একাকী ঘুরে এসেছেন নানা স্থানে, এমনকি দেবলোকেও। দেব-গোষ্ঠীর প্রাগ্রসর অস্ত্রবিদ্যায় এখন সুশিক্ষিত তিনি। আর অনুভব করেন, পাঞ্চালনগরীতে বসে এই এগারটা বছর আরও দুর্মর ক্রোধে অস্থির হয়ে উঠছেন দ্রৌপদীপিতা দ্রুপদ। কারণ যে দ্রোণাচার্যের বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহায় অধীর তিনি, যে দ্রোণাচার্য অধিকার করে নিয়েছিলেন তাঁর রাজ্যের অর্ধাংশ, সেই দ্রোণাচার্যের হাতেই পাণ্ডবদের ছেড়ে যাওয়া ইন্দ্রপ্রস্থের শাসনভার তুলে দিয়েছে দুর্যোধন। সবকিছু মিলিয়ে কুন্তীর চোখের সামনে ভেসে ওঠে একটিই রক্তস্নাত দৃশ্য : যুদ্ধ! পুত্রেরা প্রস্তুত হচ্ছে যুদ্ধের জন্য।

প্রস্তুত হচ্ছে দুর্যোধনও। সে-ও জানে, ত্রয়োদশ বর্ষের অবসানে পাণ্ডবরা ফিরে আসবে যুদ্ধার্থী হয়েই। দাবি করবে ইন্দ্রপ্রস্থের অধিকার। কিন্তু এতদিন পরে সে অধিকার আর ফিরিয়ে দেবে না দুর্যোধন। যুদ্ধ, শুধু যুদ্ধ নয়, এক মহাযুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী,

অপরিহার্য।

হিসেব মেলান বৃদ্ধা রমণী। মেলে না হিসেব। একটিমাত্র মানুষের উপস্থিতি পরিমাপের তুলাযন্ত্রকে হেলিয়ে দেয় দুর্যোধনের দিকেই। দিবাস্বপ্নে পুত্রদের রুধিরাক্ত কলেবর দেখতে পান কুন্তী, দুঃস্বপ্নে দুলে যায় অর্জুনের ছিন্নশির।

হিসেব মেলান কুন্তী। মহাযুদ্ধ যদি সত্যিই শুরু হয়, তাহলে তাঁর পুত্রদের পক্ষে কোন্ কোন্ বীর প্রধান ভরসাস্থল হয়ে দাঁড়াবেন? কৃষ্ণ, সাত্যকি, হয়ত বলরাম, ধৃষ্টদ্যুম্ন, দ্রুপদ, পৌত্র ঘটোৎকচ, অভিমন্যু, আর পঞ্চভ্রাতা, যাদের প্রধান ভীমসেন এবং সর্বোপরি অর্জুন। আর কৌরবপক্ষে? পাণ্ডবদের প্রতি সবটুকু ভালবাসা থাকা সত্ত্বেও মহাবীর ভীষ্ম, আচার্য দ্রোণ বা কৃপাচার্যের পক্ষে সম্ভব হবে না পাণ্ডবপক্ষে যোগ দেওয়া, কারণ তাঁরা কৌরব-দের অর্থের দাস, অন্নের দাস। থাকবেন অশ্বত্থামা, ভূরিশ্রবা, ভগ-দত্ত, হয়ত রুক্মী, স্বয়ং দুর্যোধন, দুঃশাসন, শকুনি, জয়দ্রথ এবং অঙ্গরাজ কর্ণ। ঠিক এইখানে এসেই হিসেবে গরমিল। অন্যদের নিয়ে চিন্তিতা নন কুন্তী। কৃষ্ণ-অর্জুন পাশাপাশি যুদ্ধক্ষেত্রে দাঁড়ালে অন্যদের সাধ্য হবে না তাঁদের প্রতিহত করার। পারেন হয়ত ভীষ্ম আর দ্রোণ। কিন্তু রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেও পঞ্চ-পাণ্ডবের মৃত্যুবাণ কখনোই নিক্ষিপ্ত হবে না তাঁদের ধনু থেকে, পথ রোধ করে দাঁড়াবে বুকভরা স্নেহ। কিন্তু আর-একজন, যে বহু-বছর ধরে অপেক্ষায় আছে অর্জুনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধের জন্য, প্রকাশ্য রাজসভায় যে চরম লাঞ্ছনার মুখে ঠেলে দিয়েছে পুত্রবধূ দ্রৌপদীকে, দুর্যোধনের যে প্রধানতম সহায়—সেই কর্ণ?

ঐ একটিমাত্র যোদ্ধার উপস্থিতিতেই তুলাদণ্ড ঝুঁকে পড়ে দুর্যোধনের দিকে। ঐ একটিমাত্র যোদ্ধাই পারে অর্জুনকে নিহত করতে—যতই থাকুক অর্জুনের হাতে গাণ্ডীব, কৃষ্ণের সুদর্শন চক্র। সব ব্যর্থ, সব অস্ত্র ব্যর্থ হবে কর্ণকে আহত করতে, প্রাণ দিতে হবে অর্জুনকে। আর অর্জুনের মৃত্যু মানেই পাণ্ডব-

পরাজয়।

সব অস্ত্র ব্যর্থ হবে, কারণ অঙ্গরাজ কর্ণ এক দুর্ভেদ্য বর্মের অধিকারী। অতি কঠিন কোন ধাতু বা অন্যকিছু দিয়ে প্রস্তুত সে বর্ম। ঐ বর্ম অঙ্গে থাকলে কর্ণকে আঘাত করা কোনমতেই সম্ভব হবে না অর্জুনের পক্ষে।

তাহলে ?

নিহত হবে অর্জুন ? পরাজিত হবে তাঁর পুত্ররা ? যুদ্ধক্ষেত্রে সন্তানদের রক্তাক্ত নিষ্প্রাণ মুখগুলি দর্শন করতে হবে কুন্তীকে ?

না ! না !

ঠিক এক বছর পর। হিসেবমতো পাণ্ডবদের বনবাসের বার বছর পূর্ণ হয়েছে সবেমাত্র। এবার অজ্ঞাতবাসের পালা। আত্মপরিচয় গোপন করে তাঁদের কাটাতে হবে একটা বছর। তারপরই ফিরবেন তাঁরা, আর তখন .....

গভীর রাতে বিদুরের গৃহে নিজস্ব কক্ষটিতে নিদ্রাহীন বসে আছেন কুন্তী। এই রাতে, তিনি আসবেন। কিংবা, সে আসবে। জীবনের এই অন্তিম আহ্বান। দুর্বাসাপ্রদত্ত বহু-পুরনো সেই অভিজ্ঞানটি শেষবারের মতো বিদুরের হাতে তুলে দিয়েছিলেন কুন্তী। অর্থ বোঝেন নি বিদুর, কিন্তু বিনা প্রশ্নে পালন করেছেন আজ্ঞা। সেই অন্তিম আহ্বানে, আজ আসবে সে। এই রাতে। এই কক্ষে। সবার দৃষ্টি এড়িয়ে।

সমগ্র হস্তিনাপুর ঘুমডুবো। নিজের নিজের কক্ষে নিদ্রায় মগ্ন বিদুরের স্ত্রী-পুত্র-পুত্রবধূরা। রাত ক্রমে গাঢ় হচ্ছে, শূন্য জুড়ে পুরু হয়ে উঠছে অন্ধকারের আস্তরণ। নিজের অনেকটাই কোথায় যেন খুইয়ে এসে একটুখানি শরীর নিয়ে টিমটিম করছে চাঁদটা।

দুয়ারে পরিচিত সংকেত। উঠে গেলেন কুন্তী। প্রায়-ফিস-ফিস পরিচিত কণ্ঠস্বর, উনি এসেছেন।

আসতে বলো।

একটি মানুষ এসে দাঁড়ালেন কক্ষে। চলে গেলেন বিদুর। কুন্তী আহ্বান জানালেন, আসুন দেবরাজ, আসন গ্রহণ করুন।

দেবরাজ। দেবরাজ ইন্দ্র! কুন্তীর শরীরে ছাপ রেখে যাওয়া শেষ পুরুষটি এতদিন পর আবার এসে দাঁড়িয়েছেন তাঁর সামনে। জীবনে শেষবারের মতো দেব-আহ্বান করেছেন কুন্তী। না, প্রথম পুরুষ দুর্বাসার মতো শেষ পুরুষ ইন্দ্র কিন্তু বিস্মৃত হননি কুন্তীকে। শতশৃঙ্গ পর্বতের স্মৃতি অনির্বাণ জেগে থেকেছে তাঁর চেতনায়। কারণ ঐ নারীর সান্নিধ্যে শুধু শরীরী সুখই নয়, ভালবাসার স্নিগ্ধ পরশও অনুভব করেছিলেন ইন্দ্র। কারণ একমাত্র স্বামী পাণ্ডু এবং মনের অতলতম প্রদেশ জুড়ে ছড়িয়ে থাকা বিদুরকে বাদ দিলে, জীবনের বাকি চারজন পুরুষের মধ্যে এই মানুষটিকেই সবথেকে কাছের, সবথেকে প্রিয় মনে হয়েছিল কুন্তীর। তাই শেষবারের মতো দেব-আহ্বান করতে গিয়ে এই মানুষটিকেই মনে পড়েছে তাঁর। দীর্ঘ এক বছরের নিয়ত চিন্তায় উপায় খুঁজে পেয়েছেন কুন্তী আর সে উপায় বাস্তবায়িত করার সাধ্য বিদুরের নেই। ভেবেছেন কুন্তী। হাতের কাছে আর এমন কেউ নেই, যার হাতে নিশ্চিন্তে তুলে দেওয়া যায় এই অবশ্যপালনীয় কর্তব্যের ভার। ভাবতে গিয়ে মনে পড়েছে এই মুখ, তাঁর সন্তানের পিতা, অর্জুনের জন্মদাতা দেবরাজ ইন্দ্রের মুখ। ডেকেছেন কুন্তী। এসেছেন ইন্দ্র।

আসন গ্রহণ করলেন ইন্দ্র। কক্ষে একটিমাত্র আলো, ক্ষীণপ্রভ। ইন্দ্র বললেন, বলো কুন্তী, কেন এই একান্ত গোপন আহ্বান? এতদিন পরে, অভিসার তো নিশ্চয়ই নয়!

ইন্দ্রের পরিহাসে কুন্তীর অজস্র ভাঁজপড়া মুখে লজ্জার রক্তরঙ, অভিসার হলেই কি খুশি হতেন, দেবরাজ?

বড় সুন্দর করে হাসলেন দেবরাজ ইন্দ্র, অবশ্যই হতাম, কুন্তী। আজ আমরা দুজনেই জীবনের প্রান্তভাগে উপনীত হয়েছি সত্য। কিন্তু সেই যৌবনে তোমার কাছে যা পেয়েছিলাম আমি,

তা আমার স্মৃতিতে আজও উজ্জ্বল, আজও অম্লান। আজ এই বয়সেও যদি ডাক দিতে অভিসারে, আমার সাধ্য ছিল না তা উপেক্ষা করার। জানি, আজকের এই অভিসারের সঙ্গে আকাশ-পাতাল পার্থক্য থাকত আমাদের সেদিনের সেই সুখস্মৃতির। তব, এই একান্তে বসে দুজনে পরস্পরকে জানাতাম কিছু সুখ-দুঃখের কথা, পরস্পরের কাছে মনের ব্যথা উজাড় করে হালকা হতে পারতাম। সেই হত আমাদের অমূল্য অভিসার, কুন্তী।

তাহলে দেবরাজ—গলাটা একটু কেঁপে উঠল কুন্তীর—এ আমাদের অভিসারই।

অর্থাৎ? ইন্দ্র বিস্মিত।

দেবরাজ, আজ এতদিন পরে এক ভয়ংকর বিপদের আশংকা-তেই আমি আহ্বান করতে বাধ্য হয়েছি আপনাকে। সুখ-দুঃখের সুখটুকু বাদ দিন, শুধু আমার দুঃখের কথাটুকু শুনেই স্বাদ নিয়ে যান অভিসারের। দেবরাজ, এ বিপদে আমাকে আর আমার পুত্রদের, বিশেষত আপনার পুত্র অর্জুনকে, রক্ষা করার আর কেউ নেই।

ইন্দ্রের বুকের গভীরে কোথাও কোন করুণ রাগিনীর মূর্ছনা, এমন কী বিপদ কুন্তী, যা তোমাকে এতটা বিচলিত করে তুলেছে?

মনের মধ্যে কথাগুলো সাজিয়ে নিয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতিটা ব্যাখ্যা করতে গেলেন কুন্তী। তাঁকে থামিয়ে দিয়ে ইন্দ্র বললেন, এ-সবই আমার জানা, কুন্তী। দেবগোষ্ঠীর অধিপতি আমি। স্বাভাবিকভাবেই অন্যান্য গোষ্ঠীগুলির সংবাদ যথাসাধ্য সংগ্রহ করতে হয় আমাকে। তাছাড়া বনবাসকালে অর্জুন গিয়েছিল আমার কাছে। বিভিন্ন দেবতার কাছ থেকে সে লাভ করেছে বিভিন্ন শক্তিশালী আয়ুধ, স্বয়ং শংকরের কাছ থেকে পেয়েছে অমোঘ অস্ত্র পাশুপত। তার মুখে সবই অবগত হয়েছি আমি। এমনকি অরণ্যে গিয়ে সাক্ষাত করেছিলাম যুধিষ্ঠিরের সঙ্গেও। ফলে এ পরিস্থিতির কোনকিছুই আমার অজানা নয়। আমি জানি, দুর্যো-

ধনের সঙ্গে তোমার পুত্রদের যুদ্ধ অনিবার্য। রাজনৈতিক স্বার্থে সে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়বে সারা দেশই। কিন্তু তাতে তোমার ভীতিটা কিসের? অর্জুনের তূণীর এখন নানাবিধ উন্নত আয়ুধে সমৃদ্ধ। সে থাকতে এত দুশ্চিন্তা কিসের তোমার? কী এমন বিপদের আশঙ্কায় অস্থির তুমি?

কক্ষের ক্ষীণপ্রভ আলোয় পাণ্ডবজননীর মুখে আলো-আঁধারী বিষাদ, দেবরাজ, আমার এ আশঙ্কার উৎস অঙ্গরাজ কর্ণ।

ইন্দ্র গম্ভীর, হ্যাঁ, জানি কর্ণ মহাবীর। হয়ত অর্জুনের সমকক্ষই। কিন্তু অর্জুনের মতো অত উন্নত আয়ুধ তার সংগ্রহে নেই। অতএব দুশ্চিন্তা কোরো না।

না দেবরাজ, না। অর্জুনের শত উন্নত আয়ুধও পারবে না তার অঙ্গস্পর্শ করতে। আপনি কি জানেন না দেবরাজ, কর্ণ এক দুর্ভেদ্য বর্মের অধিকারী। সে বর্ম অঙ্গে থাকলে কর্ণ অপরাজেয়। আর তার অপরাজেয় থাকার অর্থ আমার অর্জুনের, আমার বাকি চার পুত্রের নিশ্চিত......

আসন্ন সর্বনাশের আশঙ্কায় বাকরুদ্ধ হয়ে আসে কুন্তীর। 'পুত্রদের মৃত্যু' কথাটা উচ্চারণে কি সম্মতি দেয় কোন জন্মদাত্রীর অন্তর?

এতক্ষণে যেন সচেতন হন ইন্দ্র। তাঁর সুতীক্ষ্ণ দৃষ্টি স্থির হয়ে থমকে দাঁড়ায় কুন্তীর মুখে। নির্ভুল হিসেব। দেবগোষ্ঠীর অধিপতি তীক্ষ্ণ বুদ্ধিমত্তার অধিকারী মানুষটি উপলব্ধি করেন—আসন্ন কুরু-পাণ্ডব যুদ্ধের নির্ভুল হিসেবটি স্পষ্টভাবে ছকে নিতে পেরেছেন এই অন্তরালবর্তিনী বৃদ্ধা। হ্যাঁ, কর্ণ। এবং অর্জুন। জয়-পরাজয় নির্ণীত হবে দুটি মানুষের জীবন-মৃত্যুর ভিত্তিতেই।

আমার কাছে তুমি কী আশা করো, কুন্তী? রণক্ষেত্রে অর্জুনের সহায়তায় অবতীর্ণ হওয়া? ইন্দ্রর জিজ্ঞাসায় পরিহাসের লেশমাত্রও নেই।

না দেবরাজ—কুন্তী স্থির—আপনার কাছে আমার প্রার্থনা কর্ণের ঐ বর্মটি।

ইন্দ্র শিহরিত, তা কী করে সম্ভব, কুন্তী?

সম্ভব। কুন্তী জানেন, তা সম্ভব। সব সংবাদ সংগ্রহ করেছেন তিনি। সমগ্র দেশ জুড়ে দানবীর হিসেবে অঙ্গরাজ কর্ণ আজ প্রায় কিংবদন্তীতে পরিণত। মধ্যাহ্নে স্নানান্তে কোন ব্রাহ্মণ তাঁর সামনে গিয়ে যদি প্রার্থনা করে কোন কিছু, এমনকি যে-কোন অপ্রাপ্য বস্তুও, তাঁকে বিমুখ করেন না কর্ণ। কখনও না। কুন্তীর অনুরোধ, বা একদা-শয্যাসঙ্গী পুরুষটির কাছে জীবনের অন্তিম দাবি, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে ইন্দ্রকে উপস্থিত হতে হবে কর্ণের সামনে, প্রার্থী হয়ে, আর তাঁর প্রার্থনার অভীষ্ট বস্তুটি হবে কর্ণের ঐ দুর্ভেদ্য বর্ম। শূন্যহাতে ফিরতে হবে না দেবরাজকে, কুন্তী নিশ্চিত।

অনেক অনেকক্ষণ অনড় প্রস্তরমূর্তির মতো বসে রইলেন দেবরাজ ইন্দ্র। মনের গভীরে তোলপাড় তোলপাড়। অন্যায়, সর্বার্থে অন্যায় প্রার্থনা। একটি মানুষের আত্মরক্ষার উপায়টুকু তার মহত্ত্বের সুযোগ নিয়ে কেড়ে নেওয়া, তাকে ঠেলে দেওয়া নিশ্চিত মৃত্যুর মুখে—অন্যায়, সুমেরুপ্রতিম অন্যায়।

অথচ, এ অনুরোধ কুন্তীর। ইন্দ্রর জীবনের এক ভুলতে-না-পারা নারীর। এ অনুরোধ প্রত্যাখ্যানের সাধ্য ইন্দ্রর নেই। দেবরাজ আজ অসহায়, নিরুপায়।

নিস্তব্ধ রাত্রির কোন নিবিড়তম প্রহরে কুন্তীর চোখে চোখ রেখে ইন্দ্র বললেন, তোমার প্রার্থনা পূর্ণ হবে, কুন্তী।

অপরাহ্নবেলায় কর্ণের আবাসে ছুটে এল উদভ্রান্ত দুর্যোধন, এ কী করলে, অঙ্গরাজ? নিজের দুর্ভেদ্য বর্মটা, যার বলে তুমি ছিলে অপরাজেয়, তুলে দিলে অর্জুনজনক ইন্দ্রের হাতে? এ কী করলে তুমি?

কর্ণ হাসলেন, কী করব বন্ধু, দেবরাজ যে এসে দাঁড়ালেন প্রার্থী হয়ে, ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে।

হতাশ, ভগ্নপ্রায় দুর্যোধন বসে পড়ল দু'হাতে মুখ ঢেকে, নিজের মৃত্যু আর আমাদের নিশ্চিত পরাজয় ডেকে আনলে তুমি, অঙ্গরাজ।

দুর্যোধনের কাঁধে হাত রাখলেন কর্ণ, মৃত্যু তো জীবনের অনিবার্য পরিণতি,যুবরাজ। একদিন-না-একদিন সে তো এসে দাঁড়াবেই শিয়রে। তবু এই মৃত্যু পেরিয়েও মানুষ বেঁচে থাকে আবহমানকাল, বেঁচে থাকে তার কীর্তির মধ্যে, দুই তিন পাঁচ সহস্র বছর পরেও ভবিষ্যতের অচেনা মাটিতে অম্লান জেগে থাকে তার স্মৃতি। তোমার এই ভাগ্যতাড়িত সুহৃদটিও যে সেই অমরত্বেরই পিয়াসী, যুবরাজ। দুঃখ কোরো না। মুখ তোলো। উঠে দাঁড়াও।

মুখ তুলল দুর্যোধন। সুন্দর, পবিত্র হাসিতে উদ্ভাসিত কর্ণের মুখ, যুবরাজ, এখনই এতটা ভেঙে পোড়ো না। যুদ্ধের জয়-পরাজয়ের মীমাংসা এখনও হয়ে যায় নি। পুত্রকে বাঁচানোর জন্য আমার বর্মটি নিয়ে গেলেও, কিছুটা অপরাধবোধ বোধহয় পীড়িত করেছিল দেবরাজকে। তাই বর্মের বিনিময়ে তিনি আমাকে দিয়ে গেছেন একটি বিশেষ আয়ুধ, নাম তার একপুরুষঘাতিনী। এ অস্ত্র অপ্রতিরোধ্য। পৃথিবীর কারও সাধ্য নেই এ অস্ত্রকে প্রতিহত করার। না, অর্জুন অথবা কৃষ্ণেরও নেই। তবে এ অস্ত্র কার্যকরী হবে মাত্র একবারই। যাকে লক্ষ্য করে নিক্ষিপ্ত হবে একপুরুষঘাতিনী, তার মৃত্যু নিশ্চিত। তারপরই নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে অস্ত্রটি। কিন্তু তাতে কী যায়-আসে, বন্ধু! তোমার প্রয়োজন তো মাত্র একটিই জীবন, যে জীবনটির অবসানেই নিশ্চিত হয়ে যাবে পাণ্ডবপরাজয়।

উঠে দাঁড়ায় দুর্যোধন, অর্থাৎ……

অর্থাৎ অর্জুন। নিশ্চিন্ত থাকো যুবরাজ, বিজয়লক্ষ্মী এখনও তোমার হাতছাড়া হয়ে যান নি।

সব চেষ্টাই ব্যর্থ। এখন মহাযুদ্ধের সুনিশ্চিত তূর্যনাদ। অজ্ঞাতবাসের অবসানে নিজেদের রাজ্য ফিরে চেয়েছিলেন পাণ্ডবরা। সম্মত হয় নি দুর্যোধন। ব্যর্থ হয়েছে দ্রুপদপ্রেরিত পাঞ্চাল পুরোহিতের দৌত্য, কৌরবপক্ষীয় সঞ্জয়ের দৌত্য। যুদ্ধই চায় দুর্যোধন। আর, নিরপেক্ষ বিচারে, পাণ্ডবপক্ষও কি শান্তিকামী? তা-ই যদি হয়, তাহলে পুরোহিতকে কৌরবসভায় দূত হিসেবে পাঠানোর সময় কেন নির্দেশ দিয়েছিলেন মহারাজ দ্রুপদ—হে ব্রাহ্মণ, আপনি ধৃতরাষ্ট্রকে প্রসন্ন করে তাঁর যোদ্ধাদের মনের গতি পরিবর্তন করার চেষ্টা করবেন? কেন বলেছিলেন—আপনার কথা শোনার পর বিদুরও সচেষ্ট হবেন ভীষ্ম, দ্রোণ, কৃপাচার্য প্রভৃতির মধ্যে পারস্পরিক মতভেদ সৃষ্টি করার জন্য? আর কেনই-বা তাঁর মুখে উচ্চারিত হয়েছিল—অমাত্যদের মধ্যে বিভেদ দেখা দিলে এবং সৈনিকরা বিমুখ হলে তাদের একতা রক্ষার জন্যই ব্যস্ত হতে হবে কৌরবদের আর সেই অবকাশে সৈন্যসংগ্রহ প্রভৃতি সাংগ্রামিক কাজ সম্পাদন করে নিতে পারব আমরা, এবং এটাই এখন আমাদের প্রধান প্রয়োজন?

না, প্রকৃত অর্থে শান্তি চান নি পাণ্ডবরাও, অন্তত পাঞ্চালরাজ দ্রুপদ তো ননই। দ্রোণের বিরুদ্ধে প্রতিশোধস্পৃহায় আজও অস্থির তিনি।

যুদ্ধ অনিবার্য। তার প্রস্তুতিও সম্পূর্ণ। দু'পক্ষেই যোগ দিয়েছেন দেশের বিভিন্ন প্রান্তের রাজন্যবর্গ। অভিমন্যুর সঙ্গে মৎস্যরাজ বিরাটের কন্যা উত্তরার বিবাহসূত্রে পাণ্ডবপক্ষ মিত্র হিসেবে পেয়েছে মৎস্যরাজ্যকে। আশ্চর্য, নকুল-সহদেবের মাতুল মাদ্রীভ্রাতা শল্য সসৈন্যে যোগ দিয়েছেন কৌরবপক্ষে! আরও আশ্চর্য, দ্বারকা থেকে প্রায় কোন সহায়তাই পান নি পাণ্ডবরা! স্বয়ং বলরাম নিরপেক্ষ থেকেছেন। কৃষ্ণপুত্র মহাবীর প্রদ্যুম্ন বা

শাম্বরা যোগ দিতে আসে নি পাণ্ডবপক্ষে। বরং বিশাল বাহিনী নিয়ে কৌরবপক্ষে যোগ দিয়েছেন ভোজরাজ কৃতবর্মা। পাণ্ডবপক্ষ পেয়েছে শুধু সাত্যকি, চেকিতান আর কৃষ্ণকে। তা-ও, এই মুহূর্তের আশ্চর্যতম সংবাদ, পাণ্ডবপক্ষে যোগ দিলেও অস্ত্রধারণ না করার ঘোষণা করেছেন কৃষ্ণ। যুদ্ধক্ষেত্রে অর্জুনের সারথি হবেন তিনি, পরিচালনা করবেন তাঁর কপিধ্বজ রথটিকে। কেন এই সিদ্ধান্ত কৃষ্ণের, জানা যায় নি।

ভারতবর্ষের মাটিতে যুদ্ধের অভ্রান্ত পদধ্বনি।

আগামীকাল শেষ চেষ্টা করতে কৌরব-রাজসভায় আসবেন স্বয়ং কৃষ্ণ।

আজ সারাদিন কুন্তী অস্থির। অজ্ঞাতবাসের সময়সীমা উত্তীর্ণ হওয়ার পরও, পুত্রদের মুখদর্শন করার সৌভাগ্য আজও হয় নি তাঁর। পঞ্চপাণ্ডব এখন উপপ্লব্যনগরে। যাবতীয় উদ্যোগ পরিচালিত হচ্ছে সেখান থেকেই। হায় দুর্ভাগিনী, পৌত্র অভিমন্যুর সঙ্গে উত্তরার বিবাহে দিগ্বিদিকে নিমন্ত্রণ জানিয়ে দূত পাঠানো হলেও, একবারের জন্যও বোধহয় পঞ্চপুত্রের মনে পড়ে নি বৃদ্ধা জন্মদাত্রীর অথবা এই স্নেহান্ধ পিতামহীটির কথা। অভিমন্যুর বিবাহবার্তা এসে পৌঁছয় নি কুন্তীর কাছে। বিবাহ সমাধা হওয়ার পর, লোকমুখে শোনা সংবাদ তাঁকে শুনিয়ে গেছেন বিদুর।

নিঃস্বতা। সর্বহারা যন্ত্রণা। উপেক্ষার গ্লানি। অজ্ঞাতবাস সমাপ্ত, অথচ আজও তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় নি একটিও পুত্র, হয়ত মনেও পড়ে নি দীর্ঘ তেরো বছরের অদর্শনে ব্যাকুলা জননীর ব্যথাতুর মুখখানি। এমনি করেই বুঝি খসে যায় জীবনের এক-একটি পাতা, বৃক্ষতলে জমে ওঠে ঝরাপাতার স্তূপ আর অবশেষে একদিন নিষ্পত্র বৃক্ষটি পরিণত হয় চিতাগ্নির জ্বালানীতে।

অথচ তবুও কোথায় যেন জননীহৃদয়ে সুতীব্র আলোড়ন।

সন্তান…গর্ভ চিরে পৃথিবীর মাটিতে নিয়ে আসা সন্তানদের জীবন…বিপন্ন, মৃত্যুমুখী…

এতকিছুর পরেও শংকা যে ধ্রুব সত্য আজও! দুর্ভেদ্য বর্মটি হারিয়েও সেই কি-এক একপুরুষঘাতিনী, সুনিশ্চিত মারণাস্ত্র…

স্বস্তি নেই, স্বস্তি নেই। সেই অস্ত্রেই লেখা আছে অর্জুনের অন্তিম ঠিকানা। না, ইন্দ্রকে দোষ দিতে পারেন নি কুন্তী। নিষ্ঠুর প্রতারণায় যে হতভাগ্যের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে তার আত্মরক্ষার নিশ্চিত আশ্রয়টুকু, তার হাতে নিজের জীবন-রক্ষার অন্তত একটি আচ্ছাদনও তো থাকা প্রয়োজন! দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণের ক্রোধ মুছে কুন্তীর দুই চোখে বাষ্প জমেছে, ঘনিয়েছে কয়েক ফোঁটা শিশিরস্নাত রাতঃ হায় দুর্ভাগা, কেন এত মহৎ তুই, কিসের আশায় তুই হৃৎপিণ্ডে জ্বালিয়ে রাখিস রক্তদীপ!

কিন্তু অর্জুন, একপুরুষঘাতিনী, নিশ্চিত পরাজয়…অধিরথ-রাধার পালিত পুত্র ঐ কর্ণ, পরিত্যক্ত সন্তান—একটিমাত্র পথ, সর্বনাশা, শেষ উপায়…বিদুর নয়, বিদুর হতে পারে না। জীবনের সে অধ্যায় উন্মোচিত করা যায় না ঐ আজীবন-প্রেমিক মানুষটির কাছে। আর কাউকে প্রয়োজন, এমন কাউকে, যে উপস্থিত থাকবে রণক্ষেত্রে, প্রতিমুহূর্তে, যার উপস্থিতি প্রতিনিয়ত সেই সুমহান-দুর্ভাগাকে কশাঘাতে স্মরণ করাবে…প্রতিমুহূর্তে, কোন ভয়ংকর-তম প্রহরেও, যখন হয়ত তার অবাধ্য হাত খুঁজে নিতে চাইবে সেই অমোঘ আয়ুধ, একপুরুষঘাতিনী…আগামীকাল আসবে কৃষ্ণ, এই হস্তিনায়। কৃষ্ণ, সেই তৃতীয় যুবক, পঞ্চপুত্রের 'ভবিষ্যতের রূপকার'—একবারও কি সে আসবে না বিদুরের গৃহে, এসে দাঁড়াবে না এই বৃদ্ধা পিতৃষ্বসার সামনে? আসতেই হবে তাকে…শেষ পথ, চরম উপায়…তাথৈ স্রোতের অশ্বনদী, হা-হা-হা রাক্ষসী তুই …রাক্ষসী হই, পিশাচী হই, সবার আগে জননী আমি, জন্মদাত্রী, স্তনদায়িনী! আমার পাপে, অপার অগাধ অমেয় পাপে, সঞ্চিত হোক আত্মজদের জীবনরসদ। নরক যদি জ্বালায় আমায়, জ্বলবো

শব্দহীন। অথৈ সাগর পেরিয়ে এসে ডাঙায় উঠুক আত্মজরা…

এলেন কৃষ্ণ। হস্তিনাপুরে এসে ধৃতরাষ্ট্র, ভীষ্ম, দ্রোণদের কুশল-সম্ভাষণ জানিয়ে, পা রাখলেন বিদুরের গৃহে। কৌরব-সভায় সন্ধিপ্রস্তাব উত্থাপন করার আগেই বিদুরের সঙ্গে কিছু আলোচনা সেরে নেওয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন সেই রমণীর সঙ্গে সাক্ষাত করাও। কৃষ্ণ তীক্ষ্ণধী। অন্য কেউ না বুঝলেও তাঁর অন্তত বুঝে নিতে অসুবিধে হয় নি, কার ডাকে সাড়া দিয়ে কর্ণের বর্মপ্রার্থী হয়েছিলেন ইন্দ্র।

বিদুরের সঙ্গে আলোচনা সমাপন করে কুন্তীর সামনে এসে দাঁড়ালেন কৃষ্ণ, প্রণাম পিতৃষ্বসা।

নিজেকে আর সংবরণ করতে পারলেন না কুন্তী। ভ্রাতুষ্পুত্র-টিকে আলিঙ্গন করে কেঁদে উঠলেন হু-হু করে। কেমন আছে তাঁর যুধিষ্ঠির, ভীম, অর্জুন, নকুল, সহদেব? কেমন আছে দ্রৌপদী? তাঁর অনেক ভালবাসার পৌত্ররা?

পিতৃষ্বসাকে সান্ত্বনা দিলেন কৃষ্ণ। ভালো আছে, সকলেই ভালো আছে। জননীকে প্রণাম জানিয়েছেন পঞ্চপাণ্ডব।

নিজেকে সংযত করে কুন্তী প্রশ্ন করলেন, যুদ্ধ তো অনিবার্য, বৎস। এ যুদ্ধের ফল কী হবে বলে তোমার অনুমান?

কৃষ্ণের মুখে প্রত্যয়ের স্মিত হাসি, পাণ্ডবপক্ষের জয় সুনিশ্চিত, পিতৃষ্বসা। নিশ্চিন্ত থাকুন আপনি।

কৃষ্ণকে বিস্মিত করে তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলেন কুন্তী, না বৎস, পাণ্ডবপক্ষের জয় সুনিশ্চিত নয়। তুমি কি বিস্মৃত হচ্ছো কৌরব-পক্ষে আছে অতুলনীয় মহাবীর কর্ণ, যে অর্জুনের সমকক্ষ তো বটেই, এমনকি হয়ত-বা শ্রেষ্ঠতরও?

আবার হাসলেন কৃষ্ণ, বিস্মৃত হই নি, পিতৃষ্বসা। কিন্তু সে তো এখন আর আগের কর্ণ নেই। তার সেই দুর্ভেদ্য বর্মটি থেকে আপনি তো তাকে আগেই বঞ্চিত করেছেন।

কুন্তী স্তম্ভিতা, তুমি কী করে জানলে ?

ও-টুকু আমার অনুমান, পিতৃষ্বসা।

আজ যেন নতুন করে ভ্রাতুষ্পুত্রটির বুদ্ধিমত্তার পরিচয় পেলেন কুন্তী। হ্যাঁ, এর ওপর নির্ভর করা চলে। বললেন, কিন্তু সে বর্ম না থাকলেও তার হাতে আছে অমোঘ একপুরুষঘাতিনী শক্তি। তা থেকে অর্জুনের রক্ষা পাওয়ার কোন উপায় কি তোমার জানা আছে, বৎস ?

এখনও জানা নেই, তবে কার্যক্ষেত্রে কিছু-একটা পন্থা উদ্ভাবন করতে পারব বলেই আশা করি।

স্থিরদৃষ্টিতে কৃষ্ণের দিকে তাকালে কুন্তী, সে পন্হাটা আমার থেকেই জেনে যাও, বৎস। কিন্তু তার আগে প্রথমে প্রশ্ন করি, কর্ণ যে তার পিতামাতার পালিত পুত্র, প্রকৃতপক্ষে সে যে এক পরিত্যক্ত সন্তান—তা কি তুমি জানো ?

তীক্ষ্ণধী কৃষ্ণ হতচকিত, বিভ্রান্ত —হ্যাঁ, শুনেছি পিতৃষ্বসা। কিন্তু হঠাৎ এ প্রশ্ন ?

বৎস, আজ তোমাকে আমার জীবনের এক একান্ত গোপন কাহিনী শোনাব। লজ্জার, কলঙ্কের কাহিনী। এ-কথা কোনদিন জানাতে পারি নি কাউকে। আজ নিতান্ত বাধ্য হয়েই তোমার কাছে বিবৃত করছি সে ঘটনার কথা। শোনার পর বুঝবে আমার এ প্রশ্নের তাৎপর্য কী।

লজ্জা। লজ্জা, সংকোচ, শ্বাসরোধী গ্লানি। তবু বলতে হয়। বলে যান কুন্তী। ধীরে ধীরে, অনেক কষ্টে। কুন্তি-ভোজের প্রাসাদ, দুর্বাসা, পরিচর্যা, সেই সব-ভোলানো বন্যাপ্রতিম রাত, গর্ভ, ধাত্রী, গোপনীয়তা আর শেষের সেই মরণগন্ধী মুহূর্তে একটি শিশুকে মঞ্জুষার আশ্রয়ে ভাসিয়ে দেওয়া অশ্বনদীর স্রোতে। এক কুমারীজননী পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিল তার সদ্যো-জাত প্রথম পুত্রটিকে।

প্রায় আর্তনাদ ধ্বনিত হয় কৃষ্ণের কণ্ঠে, অর্থাৎ, অঙ্গরাজ কর্ণই

আপনার সেই পরিত্যক্ত পুত্র ? কর্ণই প্রথম কৌন্তেয় ?

দুস্তর লজ্জায় চোখ নামালেন কুন্তী, না বৎস, আমার সেই সদ্যোজাত নিঃসহায় সন্তানের পক্ষে চার চারটি নদী পার হয়ে সুদূর চম্পানগরীতে উপনীত হওয়া সম্ভব ছিল না। অনাহারে, তৃষ্ণার জলটুকুও না পেয়ে, সে হয়ত আশ্রয় নিয়েছিল অশ্বনদীর অতলেই। না কৃষ্ণ, কর্ণ আমার সেই প্রথম পুত্র নয়।

তাহলে ? কৃষ্ণর যাবতীয় বুদ্ধিমত্তা বিলুপ্ত, তাহলে আপনার কথার তাৎপর্য কী, পিতৃষ্বসা ?

এবার দৃঢ় হল কুন্তীর কণ্ঠস্বর, কর্ণও জানে, সে এক পরিত্যক্ত সন্তান। তাকে শুধু জানাতে হবে—প্রকৃতপক্ষে সে আমারই সেই প্রথম সন্তান, যাকে আমি পরিত্যাগ করেছিলাম। অর্থাৎ পঞ্চপান্ডব তার আপন ভ্রাতা। আর কর্ণকে এ তথ্য জানানোর দায়িত্ব তোমাকেই নিতে হবে, বৎস।

কৃষ্ণ মুহূর্তকাল স্থির, নির্বাক। পরমুহূর্তেই তাঁর চোখেমুখে লক্ষ নক্ষত্রের উদ্ভাসন। নিজের বুদ্ধিমত্তার যাবতীয় অহংকারটুকু আজ নামিয়ে রেখে যাওয়া যায় ঐ বৃদ্ধার পদতলে। উঠে দাঁড়ালেন কৃষ্ণ, চোখের গভীরে উজ্জ্বল হাসি, নিশ্চিন্ত থাকুন, পিতৃষ্বসা। দায়িত্বপালনে কোন ত্রুটি হবে না আমার।

চলে গেলেন কৃষ্ণ। একলা ঘরে, অনেক দিন পর, পরম স্বস্তিতে শ্বাস নিলেন কুন্তী। এই তথ্য জানার পর কর্ণের পক্ষে আর সম্ভব হবে না আপন সহোদরদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করা। সেক্ষেত্রে দুটি মাত্র পথ খোলা থাকবে তার সামনে। এক, পান্ডব-পক্ষে যোগ দেওয়া; রণাঙ্গনে ধনুর্বাণ ধারণ করে পাশাপাশি দাঁড়াবে অর্জুন আর কর্ণ ; পৃথিবীর যাবতীয় শক্তি উড়ে যাবে ফুৎকারে। দুই, নিরপেক্ষ হয়ে যাওয়া, যুদ্ধের প্রান্তর থেকে সরে দাঁড়ানো। আর কর্ণ সরে দাঁড়ালে, দুর্যোধন কি সাহস পাবে পান্ডবদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করার ? ভাবতে ভাবতে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে কুন্তীর চোখমুখ : যুদ্ধ হয়ত হবেই না, পৃথিবীর মাটি সিক্ত

হবে না অগণন মানুষের রক্তধারায়।

যা-ই ঘটুক না কেন, একপুরুষঘাতিনী ব্যর্থ হবে তাঁর অর্জুনের জীবনপ্রদীপ নিভিয়ে দিতে।

কুন্তীর চেতনা জুড়ে পরম-পাওয়ার আবেশ।

না, হিসেব মেলে নি। ব্যর্থ হয়েছেন কৃষ্ণ। কৌরব-রাজসভায় দুর্যোধন তাঁর সন্ধির প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার পর, নিজের রথে কর্ণকে তুলে নিয়ে অনেক দূরে এক নির্জন জায়গায় গিয়ে বসেছিলেন কৃষ্ণ। বলেছিলেন সব। বলেছিলেন—তুমি প্রথম কুন্তী-পুত্র, পঞ্চপাণ্ডবের অগ্রজ। কৌরবপক্ষে যুদ্ধ করা শোভা পায় না তোমার। পাণ্ডবপক্ষে এসো, জ্যেষ্ঠ হিসেবে রাজসিংহাসনে আসীন হবে তুমিই, যুধিষ্ঠির হবেন যুবরাজ, অর্জুন হবেন তোমার রথের সারথি আর দিবসের ষষ্ঠভাগে তোমার কাছে আগমন করবেন দ্রৌপদী।

স্বয়ংবর-সভার সেই প্রত্যাখ্যান যে আজও বিস্মৃত হন নি কর্ণ, তাঁর মনের গভীরে আজও যে এক তীব্র আকর্ষণ জেগে আছে দ্রৌপদীর জন্য—তা কৃষ্ণের অজানা নয়। তাই রাজপদের সঙ্গে দ্রৌপদীকে লাভ করার একটা স্বপ্নও তিনি জাগিয়ে তুলতে চেয়েছিলেন কর্ণের মনে।

কিন্তু ব্যর্থ হয়েছে সব চেষ্টা। কর্ণ জানিয়েছেন—কুন্তী তাঁর জননী হলেও তাকে তিনি পরিত্যাগ করেছিলেন। রাধা-অধিরথের কাছেই তিনি পেয়েছেন স্নেহের পরশ, বাৎসল্যের স্বাদ। তাঁদের তিনি ত্যাগ করতে পারবেন না। আর দুর্যোধন? এই পৃথিবীতে একমাত্র তার কাছেই কর্ণ পেয়েছেন প্রকৃত মর্যাদা, বন্ধুত্বের স্বাদ। তাঁরই ভরসায় যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছে দুর্যোধন। তাকেও তিনি ত্যাগ করতে পারবেন না। রাজপদ যদি পান, তাহলে তা দান করবেন দুর্যোধনকেই। তাছাড়া, সারা দেশের মানুষ অর্জুনের একমাত্র প্রতিযোদ্ধা হিসেবে কর্ণকেই চেনে। এই

দুজনের দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখার জন্য উৎসুক হয়ে আছে সমগ্র দেশবাসী। আজ যদি হঠাৎ কর্ণ যোগ দেন পাণ্ডবপক্ষে অথবা সরে আসেন যুদ্ধক্ষেত্র থেকে, তাহলে মানুষ কি তাঁকে অর্জুনভয়ে ভীত কাপুরুষ বলেই চিহ্নিত করবে না? না, ফেরার পথ নেই কর্ণের।

হতাশ হয়েছেন কৃষ্ণ। মুগ্ধও হয়েছেন, মাথা নত হয়ে এসেছে অকৃত্রিম শ্রদ্ধায়। অক্লেশে অবহেলায় যে পরিত্যাগ করতে পারে এই বিশাল সাম্রাজ্যের রাজপদ, যাবতীয় দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও যে জয় করতে পারে দ্রৌপদীর মতো নারীকে পাওয়ার প্রলোভন—সে কত বড়, কতখানি মহৎ!

ফিরে গেছেন কৃষ্ণ। আর ঠিক সাতদিন পরে কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে শুরু হবে সেই বহু-প্রতীক্ষিত মহাযুদ্ধ।

কৃষ্ণ ফিরে গেছেন। কিন্তু, কুন্তী তো পারেন না ফিরতে! তাঁর ফেরার পথ যে চিরদিনের জন্য রুদ্ধ হয়েছিল শতশৃঙ্গ পর্বতেই, যখন তিনি জননী হয়েছিলেন। জননীর জীবদ্দশায়, জন্মদাত্রীর চোখের সামনে, কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে নিষ্প্রাণ শেষ-ঘুমে ঢলে পড়বে সন্তানরা···না, ক্ষত্রিয়নারীর আগে তিনি শুধুই নারী, শুধুই মাতা।

তাই, শেষ চেষ্টা, লাজ-মান-মর্যাদা বিসর্জন দেওয়া অন্তিম প্রচেষ্টার পথে পা বাড়াতেই হল কুন্তীকে। পায়ে পায়ে, সেই মধ্যাহ্নে, এসে দাঁড়াতে হল ভাগীরথীর তীরে, যেখানে স্নানান্তে পূর্বমুখে ঊর্ধ্বাহু হয়ে বেদমন্ত্র উচ্চারণ করছেন অঙ্গরাজ কর্ণ।

প্রখর রোদ। একটু ছায়া চাই। এই উন্মুক্ত নদীতীরে, কোথায় সেই ছায়া? আছে, ছায়া আছে। একটিই ছায়া। একটু এগিয়ে কর্ণের ঠিক পিছনে তাঁরই পরিধেয় উত্তরীয়ের ছায়াতলে আশ্রয় নিলেন কুন্তী। আহ্, কি তৃপ্তি!

মন্ত্রপাঠ শেষ করে পিছু ফিরলেন কর্ণ। দেখলেন, তাঁর সামনে এক বর্ষীয়সী নারী। বিস্মিত হলেন না অঙ্গরাজ। এ

সময় বহুজনই তাঁর সামনে এসে দাঁড়ায় প্রার্থী হয়ে। কাউকেই বিমুখ করেন না তিনি।

প্রণাম জানিয়ে কর্ণ বললেন, ভদ্রে, এই প্রখর রৌদ্রে আপনি এখানে কেন? কিছু কি চান আমার কাছে? আজ্ঞা করুন, অবশ্যই তা পালন করব আমি।

কুন্তীর গলায় কাঁপন জাগল, তোমাকে চাই, পুত্র।

কর্ণের চোখে সপ্রশ্ন দৃষ্টি, আপনার কথার অর্থ আমি উপলব্ধি করতে পারছি না, ভদ্রে।

কুন্তীর চোখ ভাগীরথীর স্রোতধারায়, আমি আমার হারানো সন্তানকে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে এসেছি, বৎস।

কে আপনি?

মনের সবটুকু শক্তি সংহত করে কুন্তী উচ্চারণ করলেন সুচিন্তিত বাক্যটি, আমি তোমার জন্মদাত্রী, বৎস। পাণ্ডবজননী কুন্তী আমি।

ক্রোধ, প্রাপ্তি, অভিমান। অভিমান আর বেদনা আর এক অদম্য ঘৃণার বিস্ফোরণ—পাণ্ডবজননী? হারানো সন্তানকে আজ, এতদিন পরে, ফিরে চান আপনি? কোন্ অধিকারে, কিসের দাবিতে আজ ফিরে চান তাকে? ক্ষত্রিয় সন্তান হয়েও জীবনে কোনদিন পাইনি ক্ষত্রিয়ের সম্মান, সমস্ত জগৎ আমাকে লাঞ্ছনা করেছে হীন সূতপুত্র বলে, এমনকি আপনার পঞ্চপুত্রও—তখন কোথায় ছিল আপনার মাতৃস্নেহ, কেন একটিবারও এসে দাঁড়ান নি সামনে, কেন এই নিষ্ঠুর পৃথিবীকে জানিয়ে দেন নি আমি আপনার সন্তান, ক্ষত্রিয়তনয়? কেন, হে পাণ্ডবজননী, কেন? আর আজ, যুদ্ধের এই সন্ধিক্ষণে, কেনই বা ফিরে চান আমাকে? আমার মঙ্গল কামনায়? মিথ্যার আশ্রয় নেবেন না পাণ্ডবজননী, আমি জানি আমার মঙ্গল-অমঙ্গলে কিছুই যায়-আসে না আপনার। পঞ্চ-পুত্রের মঙ্গল কামনায়, তাদেরই জীবনরক্ষার দুর্বার বাসনায় আজ আপনি ছুটে এসেছেন এই হতভাগ্য সূতপুত্রের কাছে, জননীর

অধিকারে ফিরে চেয়েছেন তাকে। বলুন, বলুন মাতা, আমি কি অসত্য বলছি? বলুন মাতা!

মাতা! কর্ণের কণ্ঠনিঃসৃত ঐ শব্দটিতে কি আশ্চর্য আকুতি, কি তীব্র আর্তি! আহ্, অজানা নিয়তি আমার, বুকের কত গভীর থেকে ও আমাকে সম্বোধিত করছে মাতা বলে! পাণ্ডব-জননী নয়, মাতা! ও যে সত্যিই বিশ্বাস করেছে মনেপ্রাণে—আমিই ওর জন্মদাত্রী। হায় বসুন্ধরা, কোন্ মুখে আর মিথ্যা উচ্চারণ করি আমি! সত্যিই যদি আমার সেই অশ্বনদীর অতল-ছোঁয়া সন্তান আজ ছুঁড়ে দিত এই আকুল জিজ্ঞাসা, পারতাম কি কোন মিথ্যায় তাকে প্রতারিত করতে?

পৃথিবীর সব শব্দ, সমস্ত কথা হারিয়ে, কুন্তী নির্বাক।

কর্ণের ভাঙন-ধরা গলায় এখন আশ্চর্য কোমলতা, মাতা, আপনার এই উপেক্ষিত পুত্রটির আর ফেরার পথ নেই। ভবিতব্য আমাকে টেনে এনেছে এক নির্মম পরিণতির সামনে। কোন পথ নেই, এ ভবিতব্যকে অস্বীকার করার কোন উপায় নেই আমার। কিন্তু, যদি পারতাম…আঃ, ভাবতেও কি তৃপ্তি, কি অসীম আনন্দ…আপনি আমার জননী, যুধিষ্ঠির অনুজ, আর চিরপ্রতিদ্বন্দ্বী অর্জুন আমার আপন সহোদর…অর্জুন, প্রতিভাবান, অতুলনীয়, অনিন্দ্যসুন্দর অর্জুন আমার ভ্রাতা, আমার পরম স্নেহের অনুজ! সারা পৃথিবীর সামনে যদি চিৎকার করে বলতে পারতাম—দেখে যাও ঐ অপ্রতিদ্বন্দ্বী মহাবীরকে, ঐ শৌর্যময় ধনর্ধরকে, ও আমার কনিষ্ঠ সহোদর, দেখে যাও পৃথিবীর মানুষ, এই কর্ণ ঐ মহাবীরের গর্বিত অগ্রজ। যদি পারতাম, জননী আমার! কিন্তু আজ আর তা হওয়ার নয়। প্রথম পার্থ আজ এক সুকঠিন শৃঙ্খলে আবদ্ধ, অক্ষম, অসহায়। আপনার এ সন্তানের ফেরার পথ নেই, আপনিই ফিরে যান জননী আমার—রিক্ত হাতে, প্রত্যাখ্যানের বেদনা নিয়ে।

কুন্তী মূক, চেতনা টলোমলো। ধীরে ধীরে পিছু ফিরলেন তিনি। এখন ফিরতে হবে অনেক দূর, এই অস্তিত্ব-পোড়ানো প্রখর

রোদের উজান ঠেলে।

আর ঠিক তখনই বুকভাঙা হাহাকারে নতজানু হল কর্ণের কণ্ঠস্বর, না, শূন্য হাতে ফিরে যাবেন না, মাতা। আপনার এই প্রথম সন্তান আজ পর্যন্ত স্নানান্তে তাঁর সামনে এসে দাঁড়ানো কোন প্রার্থীকে ফিরিয়ে দেয় নি শূন্য হাতে। সকলকে সব দিয়ে আজ কি ফেরাতে পারি স্বয়ং আমার গর্ভধারিণীকে, রিক্তহাতে? যা চেয়েছেন, তা দেওয়ার শক্তি আমার নেই। তবু কিছু নিয়ে যান। নিয়ে যান আমার প্রতিশ্রুতি—যুধিষ্ঠির, ভীম, নকুল আর সহদেব, আমার এই চার অনুজকে মুক্তি দিলাম আমি। আপনার এই চার পুত্রকে যুদ্ধে জীবন দিতে হবে না আমার হাতে। শুধু অর্জুন···সারা দেশের চোখ এখন কুরুক্ষেত্রে, যেখানে মুখোমুখী হবে কর্ণ আর অর্জুন···উপায় নেই মাতা, এ যুদ্ধে হয় নিহত হবে অর্জুন, অথবা এই কর্ণ। যুদ্ধশেষে পঞ্চপুত্রেরই জননী থাকবেন আপনি।

সীমাহীন নিঃস্বতার প্রান্তরে তবুও কিছু সঞ্চয়: চার পুত্র। এগিয়ে এলেন কুন্তী। গভীর গভীর স্নেহে তাঁর চোখ ছুঁয়ে গেল কর্ণের সর্বাঙ্গ। শীর্ণ হাত দুটি দিয়ে কর্ণকে আলিঙ্গন করলেন বৃদ্ধা। কর্ণের হৃদস্পন্দনে আত্মজের আত্মসমর্পণের অসীম আকুতি। কুন্তী বললেন, বৎস, চার ভ্রাতাকে যে অভয় দিলে তুমি, সেটুকু মনে রেখো। কল্যাণ হোক তোমার।

ফিরে এলেন কুন্তী। প্রতি পদক্ষেপে ক্লান্তি, গ্লানি, আত্ম-ধিক্কার। তবু তারই পাশাপাশি জননীহৃদয়ে ভবিষ্যতের হিসেব। একটা হিসেব আবছা ফুটে উঠছে চোখের সামনে।

আর ভাগীরথীতীরে অসমসাহসী কর্ণের দু'চোখ জুড়ে তখন শুধুই অজানা জন্মলগ্নের উদগ্র সন্ধান।

১৩

কুরুক্ষেত্রের প্রান্তরে এখন অসংখ্য অস্ত্রের ঝনঝনা। শুরু

হয়ে গেছে যুদ্ধ। ভীষ্মের সৈনাপত্যে রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়েছে কৌরবপক্ষ। পাণ্ডববাহিনীর সেনাপতি দ্রুপদতনয় ধৃষ্টদ্যুম্ন আর সর্বসেনাপতি স্বয়ং অর্জুন। কৃষ্ণ তাঁর রথের সারথি।

হিসেব মিলছে কুন্তীর। কারণ কৌরবপক্ষ যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেও, রণাঙ্গনে অনুপস্থিত অঙ্গরাজ কর্ণ। যুদ্ধের আগে ভীষ্ম তাঁকে অর্ধরথ বলেছিলেন। সেই তুচ্ছ কারণে কর্ণ প্রতিজ্ঞা করেছেন ঃ ভীষ্ম যতদিন রণক্ষেত্রে বিরাজ করবেন, ততদিন যুদ্ধে যোগ দেবেন না তিনি। প্রধান যোদ্ধাটিকে বাইরে রেখেই যুদ্ধে নামতে হয়েছে দুর্যোধনকে। হিসেব মিলছে কুন্তীর।

সংবাদ আসছে রণক্ষেত্র থেকে।

চতুর্থ দিনের যুদ্ধশেষে জন্মান্ধ ধৃতরাষ্ট্রের দৃষ্টিহীন চোখ-দুটি জলপ্রপাত হয়ে উঠতে চাইছিল, সব হারানোর সূচনা হল, গান্ধারী। আটটি পুত্রকে আজ হারালাম আমরা।

গান্ধারীর মাতৃহৃদয় মথিত, তবু তিনি স্থির—ভবিতব্যকে মেনে নিন, আর্যপুত্র।

কোন সান্ত্বনা কি খুঁজে পেলেন জন্মান্ধ মানুষটি ?

দুর্যোধন ছুটে গেল কর্ণের শিবিরে, অঙ্গরাজ, আমার আটজন অনুজ আজ প্রাণ দিয়েছে ভীমসেনের হাতে। এখনও তুমি উদাসীন দর্শক হয়ে থাকবে তুচ্ছ অভিমানে ?

দীর্ঘদিনের একমাত্র সুহৃদের কাতর আবেদনে কর্ণ চঞ্চল। তবুও তাঁর প্রশান্ত উত্তর, প্রতিজ্ঞাভঙ্গের অনুরোধ কোরো না, রাজন্। অপেক্ষা করো। পিতামহের পতন হলেই রণক্ষেত্রে আমাকে পাবে তুমি।

কোন দুঃসহ ব্যথা আর কোন আবছা সংশয় কি জেগে ওঠে নি দুর্যোধনের চেতনায় ?

ষষ্ঠ দিনের অবসানে নিজের শিবিরে অর্জুন নতমুখ। তাঁর পিঠে হাত রেখে কৃষ্ণ বলছিলেন, জীবনের অপর নামই তো আঘাত, অর্জুন। এখনও অনেক আঘাত যে অপেক্ষা করছে আমাদের সামনে।

মুখ তুলতে পারেন নি অপরাজেয় ধনুর্ধর। কুরুক্ষেত্রের মাটিতে আজ প্রথম জীবন দিয়েছে এক উপেক্ষিত পাণ্ডবতনয়। মারা গেছে অর্জুন-উলূপীর পুত্র ইরাবান।

দশম দিনের যুদ্ধশেষে, সেই হিমের রাতে, গগনজোড়া নক্ষত্রের দীপমালাকে আঁচল ঘিরে গোপন করল কোন-এক বিষাদময়ী হেমন্তিকা। দ্রৌপদী তাঁর সপত্নী সুভদ্রাকে বললেন, বিজয়ের প্রথম স্তম্ভটি আজ নির্মিত হল, সুভদ্রা। চরম অন্যায়, জানি। যন্ত্রণায় বিদীর্ণ হচ্ছে বুক। তবু যেন অনুভব করছি পরম স্বস্তিও।

অভিমন্যুজননী সুভদ্রার কণ্ঠে স্বস্তি-উধাও ব্যাকুলতা, কিন্তু এবার যে সেই মানুষটি এসে দাঁড়াবেন রণাঙ্গনে!

অন্যায়যুদ্ধে আজ পতন ঘটেছে পিতামহ ভীষ্মের। শরশয্যায় শয়ান তিনি। আচার্য দ্রোণের সৈনাপত্যে আগামীকাল রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হবেন অঙ্গরাজ কর্ণ।

তেরোটি দিন অতিক্রান্ত। ঘুমহারা রাতে বাতায়নে একলা ভানুমতী। দুর্যোধনজায়া ভানুমতী। এই গর্ভ একদিন যাকে চিনিয়েছিল ধরিত্রীর মাটি, চোখে দিয়েছিল প্রথম আলোর ঠিকানা, সে আজ অনেক দূরে, কোথাও কোন বিচ্ছিন্ন দ্বীপে, যেখানে কোন ডিঙি নেই, চারপাশ ঘিরে শুধুই কঠিন-কালো পাথুরে উপত্যকা।

সে নেই। দুর্যোধনতনয় লক্ষ্মণ নেই। হন্তা তার অভিমন্যু। কিন্তু, কার উদ্দেশ্যে তর্পণ করবেন চোখের জলে—ভেবে পান না

ভানুমতী। অভিমন্যুও যে নেই! ছয় মহারথ নিরস্ত্র, ক্ষতবিক্ষত করেছে তাকে, ঘাতকের ভূমিকা পালন করেছে দুঃশাসনপুত্র।

সব যায়, সব যায়, স-ব চলে যায়। নিভে যায় দীপ, আকাশ-প্রদীপ, একে একে। কিন্তু এখন তার হাতে উদ্যত আয়ুধ। অপ্রতিরোধ্য। একপুরুষঘাতিনী। এবং অর্জুন…প্রতিশ্রুতির বাইরে শুধু একজন…অর্জুন…

কেউ কেউ কথা রাখে। কথা রেখেছে সে। চার পাণ্ডব বারবার অব্যাহতি পেয়েছে তার মৃত্যুবাণ থেকে। প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে চলেছেন কর্ণ।

কিন্তু অর্জুন? ইন্দ্রদত্ত সেই অভ্রান্ত মারণাস্ত্র? রাতের পর রাত ঘুমকে ছুঁতে পারেন না কুন্তী।

নৈশযুদ্ধের প্রায় শেষ প্রহরে দ্রোণতনয় অশ্বত্থামা অবিশ্বাস্য বিস্ময়ে গান্ধাররাজ শকুনিকে বলছিলেন, এ যে নিতান্তই অকল্পনীয়, গান্ধাররাজ! এ কী করলেন কর্ণ?

শকুনি বিষণ্ণ, জানি না আচার্যপুত্র। অঙ্গরাজকে আর যেন একেবারেই বুঝে উঠতে পারছি না আমি। ভগিনীপতি জয়দ্রথকে হারিয়ে বৎস দুর্যোধন আজ শোকে, প্রতিহিংসায় অস্থির। অথচ তাঁর প্রধান সুহৃদ নিজের শ্রেষ্ঠ অস্ত্রটি বিনষ্ট করলেন নিতান্ত অবহেলায়। এ রহস্যের সমাধান আমার জানা নেই, আচার্যপুত্র।

রাত্রির যুদ্ধে ভয়ংকর রূপ নিয়েছিল ভীমাত্মজ ঘটোৎকচ। কর্ণ প্রয়োগ করেছেন তাঁর এবং সমগ্র কৌরবপক্ষের প্রধান ভরসা সেই অস্ত্রটিঃ একপুরুষঘাতিনী। নিহত হয়েছে ঘটোৎকচ। নিষ্ক্রিয় হয়েছে ইন্দ্রদত্ত আয়ুধ।

আহ্, যতবার, যতবার তূণীর থেকে হাতে তুলে নিতে চেয়েছি তাকে, দুর্বার আক্রোশে যতবার তাকে নিক্ষেপ করতে চেয়েছি

অর্জুনের দিকে, ততবারই অর্জুনের ঐ কপিধ্বজ রথের সারথিটির চোখের দিকে তাকিয়ে থেমে গেছে এই উদ্যত হাত। ঐ চোখ যে জানে সেই গোপন তথ্য, জানে—অর্জুন আমার অনুজ! ওর সামনে কী করে নিভিয়ে দিই সহোদরের জীবনপ্রদীপ! কপিধ্বজের সামনে বসে ঐ বাসুদেব কৃষ্ণ যেন আমার বিবেক হয়ে রক্তচক্ষুতে বিদ্ধ করছে আমাকে, প্রতি মুহূর্তেঃ অনুজহত্যার কলঙ্ক কি শোভা পায় তোমার? আজ তাই একপুরুষঘাতিনী অর্জুনের পরিবর্তে নিয়ে গেছে ঘটোৎকচের প্রাণ। আহ্, জন্মদাত্রী আমার, এতদিন পরে যদি এসেই দাঁড়ালে সেদিন ভাগীরথী-তীরে, তাহলে কী প্রয়োজন ছিল আর-একজনকে সেই গোপন তথ্য জানিয়ে দেওয়ার, কী প্রয়োজন ছিল এমন একজনের সামনে সেই সংবাদ উচ্চারণের যে অণুক্ষণ কঠিন প্রাচীর হয়ে দাঁড়িয়ে থাকবে অর্জুনের সামনে? এই হাত কি আর কখনও টানটান হয়ে লক্ষ্য স্থির করতে পারবে অর্জুনবধের জন্য? মৃত্যু, সব-ধোয়া শান্তিময় একমাত্র আশ্রয় আমার, আর কত দূরে তোমার আবাস?

না, ঋণশোধ হয় নি এখনও। দুর্যোধনের ঋণ। এখনও এই তূণীরে আছে ভয়ংকর ভার্গবাস্ত্র, প্রবল নাগাস্ত্র, আছে আমার, বহুদিন-সঞ্চিত একতূণীরশায়ী বাণ। দুর্যোধন, অকৃত্রিম সুহৃদ আমার, তোমার ঋণ পরিশোধ করে যাবে সূতপুত্র কর্ণ।

কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা—শোকার্ত বৃদ্ধ কৃপাচার্যের মুখে শুধু এই একটিই উচ্চারণ—কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা! বেদনায় বিবর্ণ বৃদ্ধ যোদ্ধাটি ধীরে ধীরে বেরিয়ে যাচ্ছেন কুরুক্ষেত্রের প্রান্তর থেকে। এ শোক তিনি প্রকাশ করবেন কার কাছে? ভগ্নী বৃদ্ধা কৃপীর সামনে দাঁড়িয়ে কোন্ মুখে বলবেন—ভগ্নী, নিরস্ত্র অবস্থায় তোমার স্বামীর শিরশ্ছেদ করেছে দ্রুপদপুত্র ধৃষ্টদ্যুম্ন? কিভাবে উচ্চারণ করবেন—আমার বহু সুখ-দুঃখের অন্তরঙ্গ সাথী আচার্য দ্রোণ আর নেই?

সেদিনই অনেক রাতে বিনিদ্রা দ্রৌপদীর চেতনায় অবিরাম আঘাত করছিল দুটি শব্দ : পিতা নেই, পিতা নেই!

দ্রোণের হাতে প্রাণ দিয়েছেন দ্রুপদ।

ষোড়শ দিবসের যুদ্ধশেষে কুন্তীর সামনে এসে দাঁড়ালেন বিদুর, কৌরববাহিনী আজ কর্ণের সৈনাপত্যে যুদ্ধ করল, আর্যে। তাত ভীষ্ম আর আচার্য দ্রোণের পর কর্ণই এখন কৌরব-সেনাপতি।

বিশেষ কোন সংবাদ, বিদুর ? কুন্তী উদ্বিগ্না।

সারা কুরুক্ষেত্র এখন একটিই বিশেষ সংবাদের প্রতীক্ষায় কম্পমান, আর্যে—কর্ণ-অর্জুন দ্বন্দ্বযুদ্ধ। যতদূর বুঝেছি, আগামী কালই অনুষ্ঠিত হতে চলেছে সেই বহু-প্রতীক্ষিত মহারণ। নিজেকে আরও শক্তিশালী করে তোলার জন্য আগামীকাল তার রথের সারথি হওয়ার জন্য মদ্ররাজ শল্যকে অনুরোধ করেছে কর্ণ। কিঞ্চিৎ আপত্তির পর সম্মতও হয়েছেন শল্য। আপাতত এটুকুই সংবাদ, আর্যে। এ যুদ্ধের জয়-পরাজয় এখন নির্ভর করছে আগামীকালের ওপর।

সত্যিই কি তাই, বিদুর ? কর্ণের সেই দুর্ভেদ্য বর্ম আর নেই। অমোঘ একপুরুষঘাতিনী শক্তিও হাতে নেই তার। এদিকে অর্জুনের সংগ্রহে রয়েছে অজস্র উন্নত আয়ুধ। আগামীকাল যদি হয়ও দ্বন্দ্বযুদ্ধ, কর্ণের পরাজয় তো প্রায় অবধারিত, বিদুর!

বিষণ্ণ হাসলেন বিদুর, আপনার উচ্চারিত ঐ 'প্রায়' শব্দটির মধ্যেই তো এ প্রশ্নের উত্তর নিহিত রয়েছে, আর্যে। এতকিছুর পরেও আজও আমরা নির্দ্বিধায় বলতে পারি না—কর্ণের পরাজয় অবধারিত। বলতে হয়—প্রায় অবধারিত। আর্যে, বীরত্বে বা রণনৈপুণ্যে সে অর্জুনের সমকক্ষ তো বটেই, হয়ত-বা শ্রেষ্ঠতরও। তাছাড়া বর্ম বা একপুরুষঘাতিনী না থাকলেও তার তূণীরে এখনও রয়েছে ভার্গবাস্ত্র, নাগাস্ত্র, একতূণীরশায়ী ভয়ংকর বাণ। এখনও অর্জুনের জয় সুনিশ্চিত নয়, আর্যে। সত্যি বলতে কি, নিরস্ত্র

অবস্থায় ছাড়া কর্ণকে নিহত করা এখনও অসম্ভব। স্বয়ং কৃষ্ণও এই মতই পোষণ করেন।

নিরাপদ ডাঙা থেকে আবার কোন নিথৈ সাগরে নিমজ্জিতা হলেন কুন্তী। এত প্রচেষ্টা, এত নির্মম উদ্যোগের পরও নিঃশঙ্ক নয় অর্জুন? আজওসে জীবন-মৃত্যুর পলকাসুতোয় দোলায়মান? এতকিছুর পরেও জীবনরঙা সেই স্বপ্নসবুজ দ্বীপ আজও এত দূরে?

উঠে দাঁড়ালেন কুন্তী। অস্থির ঘুরলেন ঘরময়। একটা ডিঙি চাই, শেষ পারানির ডিঙি।

সহসা থমকে দাঁড়ালেন কুন্তী, তীব্র ব্যগ্রতায় কেঁপে গেল তাঁর কণ্ঠস্বর, আগামীকাল কর্ণের রথের সারথি কে হবেন বললে?

মদ্ররাজ শল্য, আর্যে।

দ্রুতপায়ে বিদুরের সামনে এসে দাঁড়ালেন কুন্তী, মদ্ররাজ কৌরবপক্ষে কেন যোগ দিয়েছিলেন, বলতে পারো বিদুর?

রাজনৈতিক এবং ব্যক্তিগত কারণে মদ্ররাজ প্রচণ্ড কৃষ্ণবিরোধী। কৃষ্ণ যে পক্ষে থাকবেন, সে পক্ষে কখনোই যোগ দিতে পারেন না শল্য। তাই আপন ভগ্নীপুত্রদের পরিত্যাগ করে তিনি যোগ দিয়েছিলেন কৌরবপক্ষে।

বিদুর—প্রবল উত্তেজনায় কুন্তীর স্বর অসংলগ্ন—কর্ণের অতীত সম্বন্ধে খোঁজ নিতে বলার পর অনেক অনুসন্ধান করে তার জীবনের দুটি অভিশাপের সংবাদ তুমি এনে দিয়েছিলে আমায়, মনে আছে তোমার?

শল্য সংক্রান্ত প্রশ্নের পরই আকস্মিক এই অসংলগ্ন প্রশ্নে বিদুর কিছুটা, বিমূঢ় আছে আর্যে। কর্ণ ব্রাহ্মণ নয় জানার পর গুরু পরশুরাম তাকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন—চরম সংকটের সময় তুমি বিস্মৃত হবে ব্রহ্মাস্ত্রের প্রয়োগকৌশল। আর এক ব্রাহ্মণ অভিশাপ দিয়েছিলেন—জীবনের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বীর সঙ্গে যুদ্ধের সময় তোমার রথচক্র বসে যাবে মেদিনীতে আর সেই অবসরে তোমার

শিরশ্ছেদ করবে সেই প্রতিদ্বন্দ্বী। কিন্তু এখন এ প্রশ্ন কেন, আর্যে ?

বিদুরের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোন প্রয়োজন বোধ করলেন না কুন্তী। তাঁর স্খলিত কণ্ঠে নির্দেশের সুর, তোমাকে এখনই একবার মদ্ররাজ শল্যের সঙ্গে সাক্ষাত করতে হবে, বিদুর। যে-কোন উপায়েই হোক।

মদ্ররাজ শল্যের সঙ্গে, আর্যে ? কিন্তু কেন ? বিদুর দিশা-হারা।

আহ্, বিদুর, প্রশ্ন কোরো না। উত্তর আগামীকালই জানতে পারবে।

দীর্ঘক্ষণ নীরবে কুন্তীর নির্দেশ শুনে গেলেন আজন্ম-তিয়াসী, চির-অনুগত মানুষটি। তারপর তাঁকে দেখা গেল পথে। সতর্ক পায়ে এগিয়ে চলেছেন মদ্ররাজ শল্যের শিবির অভিমুখে।

একলা ঘরে কুন্তী তখন ভাঙছেন, ভেঙে পড়ছেন, সমস্ত চিন্তা-চেতনা-বোধ লুপ্ত হয়ে ডুবে যাচ্ছেন কোন পাপনাশক আগুনের প্লাবনে।

অঙ্গরাজ কর্ণের এই রথে আজ আমি সারথি। আজকের চরম-যুদ্ধে কর্ণকে রক্ষা করার দায়িত্ব এখন অনেকটাই আমার ওপর, ঠিক যেমন অর্জুনকে রক্ষার দায়িত্ব কৃষ্ণের। কৃষ্ণ! এ নাম আগুন জ্বালায় আমার রক্তে। তার রাজনৈতিক উচ্চাকাঙ্ক্ষা আমার অসহ্য।

অথচ···হায় অঙ্গরাজ! তোমার এই রথের রশির সঙ্গে সঙ্গে তোমার অনিবার্য করুণ মৃত্যুর অদৃশ্য রশিটিও যে আজ উঠে এসেছে এই মদ্ররাজ শল্যেরই হাতে! কুন্তীর অনুরোধ! আমার সহোদরা মাদ্রী, সে আজ কোথায়, কত দূরে, তার সপত্নীর সনির্বন্ধ অনুরোধ, আমার সেই হারানো সহোদরার রক্তেমাংসে গড়া নকুল-সহদেবের জীবন, ভবিষ্যৎ—হ্যাঁ, অর্জুনের জীবন-মরণের সঙ্গেই অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ। অস্বীকার করার উপায় নেই আমার।

অঙ্গরাজ, তুমি অথবা অর্জুন, এই পৃথিবীর মাটিতে থাকতে হবে একজনকেই। হতভাগ্য অঙ্গরাজ, তোমার এই সারথিটি জানে, পৃথিবীর মাটিতে থেকে যাবে অর্জুনই, তোমার জীবনে আজই শেষ সূর্যোদয়।

কাল রাতে জেনেছি সেই অভিশাপ—চরমযুদ্ধে মাটিতে বসে যাবে তোমার রথের চাকা। তখন নিরস্ত্র তোমাকে…যদিও জানি না কিভাবে তা সম্ভব, কিভাবে এই রথচক্র আশ্রয় নেবে মাটির গভীরে—এখনও জানি না আমি। এই মাটি, কুরুক্ষেত্রের এই প্রান্তর অবশ্য এখন অমেয় রক্তের ধারায় সিক্ত, নরম, তবুও… নকুল-সহদেব, ভগ্নীপুত্র আমার, মাদ্রীর উত্তরাধিকার, শেষ স্বাক্ষর…

সারাক্ষণ কর্ণকে কটূক্তিতে উত্যক্ত করে গেলেন শল্য। কর্ণ কখনও হাসলেন, কখনও ক্রুদ্ধ হলেন। তাঁর আক্রমণে পলায়ন করলেন পরাজিত যুধিষ্ঠির। অগ্রজের সঙ্গে এগিয়ে এলেন নকুল-সহদেব। পরাজয়ের গ্লানি নিয়ে পিছু ফিরতে হল তিনজনকেই। বিধ্বস্ত যুধিষ্ঠির আশ্রয় নিলেন শিবিরে।

ওদিকে তখন একের পর এক নিহত হচ্ছেন কর্ণের পুত্ররা। দুঃশাসনকে বধ করে তার রক্তপান করেছেন ভীমসেন। পূর্ণতা পেয়েছে তাঁর প্রতিজ্ঞা। অর্জুনের ক্ষুরাস্ত্রে রণশয্যায় শয়ান কর্ণ-পুত্র বৃষসেন।

অবশেষে সেই বহু-প্রতীক্ষিত লগ্ন : জীবন অথবা মৃত্যু, রক্তের হরফে লেখা চিরদিনের কাব্য। কর্ণার্জুন মুখোমুখী দ্বৈরথ যুদ্ধে। আজ থেকে দুই-তিন-চার হাজার বছর পরেও মানুষের মুখে উচ্চারিত হবে এ যুদ্ধের কথা, চিত্রকররা আঁকিবেন অজস্র বহুবর্ণ ছবি, গীতিকারের লেখনীতে জন্ম নেবে গান, অসংখ্য লিপিকার নিজস্ব দৃষ্টিকোণ অনুযায়ী নানাভাবে ব্যাখ্যা করবেন এ যুদ্ধের তাৎপর্য।

পরস্পরের অস্ত্রাঘাতে ক্ষতবিক্ষত দুই প্রতিদ্বন্দ্বী। ভীমসেন উত্তেজিত করে চলেছেন অর্জুনকে। সচক্ষে কর্ণের নিধন দেখার জন্য শিবির থেকে বেরিয়ে এসেছেন যুধিষ্ঠির।

ভয়ংকর নাগাস্ত্রটি ধনুতে যোজনা করলেন কর্ণ। বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলেন শল্য, এই শর অর্জুনের শিরশ্ছেদনে সমর্থ হবে না, অঙ্গরাজ। অন্য কোন উপযুক্ত শর যোজনা করো ধনুতে।

কর্ণের চেতনায় দুর্যোধনের ঋণ। শল্যের কাতর আহ্বান অগ্রাহ্য করে নাগাস্ত্র নিক্ষেপ করলেন কর্ণ। সমগ্র কুরুক্ষেত্রে শ্মশানের স্তব্ধতা। অবধারিত মৃত্যু ধেয়ে আসছে অর্জুনের দিকে।

আর ঠিক তখনই নিজস্ব ভূমিকাটি যথাযথ পালন করলেন পাণ্ডবদের 'ভবিষ্যতের রূপকার' কৃষ্ণ। তাঁর পায়ের চাপে রক্তে-ভেজা নরম মাটিতে প্রায় এক হাত বসে গেল অর্জুনের কপিধ্বজ রথ। নতজানু হয়ে বসে পড়ল শ্বেত অশ্বগুলি। নাগাস্ত্র আঘাত করল অর্জুনের মুকুটে। ছিটকে মাটিতে গিয়ে পড়ল মুকুটটি। ব্যর্থ হল নাগাস্ত্র। আর, এতক্ষণে পথের সন্ধান পেলেন শল্য।

লাফ দিয়ে মাটিতে নামলেন পার্থসারথি কৃষ্ণ। মাটি থেকে তুলে আনলেন রথের চাকা। আবার সচল হল কপিধ্বজ। কিন্তু কিছু-ক্ষণের মধ্যেই সারা কুরুক্ষেত্র দেখল— অর্জুনের প্রতিদ্বন্দ্বীর রথের বাঁ-দিকের চাকাটি বসে গেছে মাটির গভীরে! অচল হয়েছে কর্ণের রথ। ব্রাহ্মণের অভিশাপ!

অমিত শক্তিশালী শল্য উপায় খুঁজে পেয়েছেন। অন্যের অলক্ষ্যে পায়ের চাপে রথের চাকাটি বসিয়ে দিয়েছেন মাটিতে। কিন্তু সবিস্ময়ে লক্ষ্য করলেন শল্য—তাঁর পায়ের চাপে মাটির যতটা গভীরে যেতে পারে রথচক্র, তার চেয়ে অনেক গভীরে চলে গেছে চাকাটি। মাটিটা কি খুব বেশি নরম ছিল? নাকি সারথির কৃতকর্মের অংশভাগী হয়ে স্বয়ং রথারোহী যোদ্ধাটিও পায়ের চাপে রথের চাকা বসিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেছিল মাটিতে? উত্তর খুঁজে পান নি শল্য।

মেদিনীর করাল গ্রাস থেকে রথচক্র উদ্ধার করা সারথিরই দায়িত্ব। অল্পক্ষণ আগেই সে দায়িত্ব পালন করেছেন স্বয়ং কৃষ্ণ। কিন্তু এবার, কুরুক্ষেত্র দেখল, নিশ্চল রথে উদাসীন বসে রইলেন কর্ণসারথি শল্য। আর, আশ্চর্য, কর্ণ তাঁকে একবার অনুরোধও করলেন না ভূপ্রোথিত চাকাটি উদ্ধার করার জন্য। শুধু, হয়ত নিজের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের অন্তিম নিদর্শনটুকু পৃথিবীর সামনে রেখে যাওয়ার জন্য, উপর্যুপরি এগারবার ছেদন করলেন অর্জুনের আশ্চর্য ধনু গাণ্ডীবের ছিলা, নিশ্চল রথে দাঁড়িয়েই এক সুতীক্ষ্ন শরে বিদ্ধ করলেন অর্জুনের বক্ষদেশ। অপরাজেয় অর্জুনের শিথিল মুষ্টি থেকে খসে পড়ল গাণ্ডীব। রথের ধ্বজদণ্ড ধরে দাঁড়িয়ে রইলেন অর্জুন ঃ কম্পমান, মূর্ছিতপ্রায়।

এবং সেই অন্তিম মুহূর্ত। রথচক্র উদ্ধারের জন্য রথ থেকে মাটিতে নেমে এলেন কর্ণ। সম্পূর্ণ নিরস্ত্র, প্রতিরক্ষাহীন। ভূপ্রোথিত চাকাটি টেনে তোলার চেষ্টা করলেন অথবা হয়ত আকণ্ঠ তৃষ্ণায় আবাহন জানালেন বহুবাঞ্ছিত সেই একমাত্র পরিণতিকে, যে পরিণতির লক্ষ্যেই ছিল তাঁর জীবনের দীর্ঘযাত্রা।

কৃষ্ণের নির্দেশে অর্জুন নিক্ষেপ করলেন ভয়ংকর অঞ্জলিক বাণ। শিহরিত হল কুরুক্ষেত্র। দু'হাতে মুখ ঢাকলেন শল্য। কর্ণের ওষ্ঠপ্রান্তে আশ্চর্য হাসির অথবা প্রাপ্তির আভা।

কুরুক্ষেত্রের মাটিতে লুটিয়ে পড়ল সূতপুত্র কর্ণের ছিন্নশির। ঋণশোধ হল না দুর্যোধনের। বুকের গভীরে শল্য উচ্চারণ করলেন —অঙ্গরাজ, আমাকে ক্ষমা কোরো। হে সুমহান মানবপুত্র, মার্জনা কোরো আমাকে!

কৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে বললেন, মহারাজ, আজ ভাগ্যক্রমে মহারথ কর্ণ নিহত হয়েছেন, ভাগ্যই আপনাদের বসিয়েছে বিজয়ীর আসনে।

যুদ্ধ দেখতে দেখতে ক্লান্ত যুধিষ্ঠির আবার ফিরে এসেছিলেন

শিবিরে। কর্ণের মৃতদেহটি স্বচক্ষে দেখার জন্য রণক্ষেত্রের দিকে এগিয়ে গেলেন তিনি।

আঁধার নেমেছে। কর্ণের মৃতদেহ ঘিরে কৌরব-পরিচারকরা জেবলে দিয়ে গেছে সুগন্ধ তৈলযুক্ত অসংখ্য কাঞ্চনময় দীপ। দেখলেন যুধিষ্ঠির। মুখে ফুটে উঠল জয়ের হাসি। বললেন, কৃষ্ণ, তুমি সহায় ও রক্ষক হওয়ার জন্যই আজ আমি ভ্রাতাদের সঙ্গে রাজপদে অধিষ্ঠিত হতে পারলাম। সূতপুত্রের বীরত্বের কথা চিন্তা করে বহু বছর আমি ঘুমোতে পারি নি শান্তিতে। আজ আমি পরম শান্তিতে ঘুমোতে পারব।

কৃষ্ণর কথার তাৎপর্যটা বুঝে ওঠা সম্ভব ছিল না যুধিষ্ঠিরের পক্ষে। কৃষ্ণ বলেছিলেন—'ভাগ্যক্রমে' নিহত হয়েছেন কর্ণ, 'ভাগ্যই' আপনাদের বসিয়েছে বিজয়ীর আসনে।

দুর্ভাগা কর্ণর এ পরিণতির অনুচ্চারিত অর্থটুকু বুঝে নিতে এতটুকু দেরি হয় নি কৃষ্ণর।

ঠিক সেই সময়েই হস্তিনাপুর রাজপ্রাসাদে ধৃতরাষ্ট্র সংজ্ঞাহীন। সব আশা শেষ। একে একে প্রায় সবকটি পুত্রকে হারিয়ে আজ তাঁর পিতৃত্ব যে দুটি মাত্র ক্ষীণসূত্রে কম্পমান, সুদর্শন আর দুর্যোধন, সে দুটি সূত্রও ঝরে যাবে আগামী দু'একদিনের মধ্যে। কারণ যে ছিল একমাত্র রক্ষাকর্তা, সে আর নেই। কর্ণ নেই।

আর, হায় মাতৃত্ব, হায় রে অব্যক্ত স্নেহ, সুখে-দুঃখে অবিচলিতা গান্ধারীও আজ দুঃসহ শোকে ভূমিশয্যায় শয়ান। এতগুলি পুত্রের মৃত্যুসংবাদ শোনার পর এবার তাঁকে শুনতে হবে শেষ দুটি পুত্রের অন্তিম পরিণতির কথাও। এতদিন ধরে নিজের চারপাশে গড়ে তোলা কঠিন প্রাচীর ভেঙে কর্ণের নাম করে একটানা বিলাপ করে চলেছেন দুর্যোধন জননী।

এবং বিদুরের গৃহে কুন্তী তখন মর্মর মূর্তির মতো দাঁড়িয়ে আছেন ধ্রুবতারার দিকে পলকহীন তাকিয়ে। আকাশের কালচে জমিতে স্থির, নিষ্কম্প জেগে আছে ধ্রুবতারা। তার অমল আলো

কুন্তীর চোখে। আরও লক্ষ বছর, হে আমার আলোদাতা ধ্রুবতারা, আরও লক্ষ কোটি বছর তুমি জেগে থাকবে ঐখানে, অনেক অনেক উঁচুতে, নিঃসঙ্গ, একা, মানুষের ধরাছোঁয়ার বাইরে, তবুও মানুষ চিরদিন পথ চিনে নেবে তোমার অমল আলোয়, তোমার উজ্জ্বল উপস্থিতিতে। হে মৃত্যুহীন, হে ধ্রুব, হে নিঃসঙ্গ পথিক, আমাকে মার্জনা কোরো না, তোমার নক্ষত্র আলোর বর্ণমালায় লিখে রেখো এই ক্ষমাহীন পাপকাহিনী আমার।

আর ঐ কালপুরুষ। মহাকাল, আমি জানি, ও কালপুরুষ নয়, কালনারী। ধ্রুবতারার পাশাপাশি আকাশের বিজন ভুঁয়ে লক্ষ বছর জেগে থাকবে ঐ কালনারীও। মহাকাল, হে সর্বদর্শী অনন্ত মহাকাল, তোমার ব্রহ্মাণ্ডজোড়া লেখনী যেন ভবিষ্যতের ভূর্জপত্রে আমার জন্যে লিখে রাখে একটিই মাত্র শব্দ : করুণা! করুণা!

যুদ্ধের অষ্টাদশ তথা অন্তিম দিনে যুধিষ্ঠিরের হাতে প্রাণ দিলেন মদ্ররাজ শল্য। একটু অবাক হয়েছিল বৈকি দর্শকরা। যুধিষ্ঠির? যুধিষ্ঠিরের মতো একজন সাধারণ ধনুর্ধরের আক্রমণে নিহত হলেন অমিত শক্তিধর মহারথ শল্য, যিনি আজ কৌরব সেনাপতি?

কিন্তু, শল্য যে বেছে নিয়েছিলেন যুধিষ্ঠিরকেই! ভীম-অর্জুন মহাবীর। তাঁদের হাতে জীবন দিলে, প্রায়শ্চিত্ত তো সম্পূর্ণ হয় না! আর মাতুল হত্যার পাপ স্পর্শ করুক আপন ভগ্নীপুত্র নকুল কিংবা সহদেবকে, তা-ও চান নি তিনি। তাই বেছে নিয়েছিলেন দুর্বল যুধিষ্ঠিরকেই, প্রাণ দিয়েছেন তাঁরই হাতে, যাতে মানুষ বলতে পারে—হায় মদ্ররাজ, এই তোমার বীরত্ব, তোমার অমিত শক্তির পরিচয়? জীবন দিয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করে গেলেন মদ্ররাজ শল্য।

সহদেব বধ করলেন শকুনিকে। নিহত হল সুদর্শন, আর

দিনান্তে অন্যায়যুদ্ধে দুর্যোধনের উরুভঙ্গ করলেন ভীমসেন। কৌরববাহিনীর একাদশ অক্ষৌহিণী সেনা নিঃশেষিত। কুরুক্ষেত্রের শ্বাপদসঙ্কুল শোণিতসিক্ত প্রান্তরে সারারাত অসহ যন্ত্রণায় ছটফট করল দুর্যোধন। রাত্রিশেষে কৌরবপক্ষের শেষ তিন জীবিত সৈনিক—অশ্বত্থামা, কৃপাচার্য, কৃতবর্মা—মুমূর্ষু যুবরাজকে সংবাদ দিলেন, রাতের অন্ধকারে পাণ্ডবশিবিরে তাণ্ডব চালিয়ে এসেছেন তাঁরা। পাণ্ডববাহিনীর সাত অক্ষৌহিণী সেনাও নিঃশেষিত। সেনাপতি অশ্বত্থামার হাতে নিহত হয়েছেন তাঁর পিতৃহন্তা ধৃষ্টদ্যুম্ন, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র। অন্যত্র থাকার জন্য বেঁচে গেছেন শুধু পঞ্চপাণ্ডব, কৃষ্ণ আর সাত্যকি। শেষ সংবাদটুকু শুনে, শেষঘুমে তলিয়ে গেল দুর্যোধন।

আঠার দিনের রক্তেভেজা ইতিহাস লিখে, শেষ হল মহাযুদ্ধ।

১৪

কুরুক্ষেত্রের অগণন মৃতদেহের মাঝে উন্মত্তার মতো ছুটে বেড়াচ্ছেন পিতা-স্বামী-পুত্র বা ভ্রাতৃহারা নারীরা। কোথায় সে, কোথায় আমার সেই পরমাত্মীয়! কোথায় পাবো তারে! কারুর মৃতদেহ রাতচরা শ্বাপদের দাঁতে অর্ধভুক্ত, কারুর শরীরটি ভূমিশয্যায় শয়ান কিন্তু ছিন্নশিরটি নিখোঁজ। অস্ত্রের একটানা ঝন্‌ঝনার অবসানে কুরুক্ষেত্র জুড়ে এখন শুধুই হাহাকার আর সর্বস্বহারানোর বুকফাটা বিলাপ।

গান্ধারী, ভানুমতী, দ্রৌপদী, সুভদ্রা, কৃপী—সকলেই এসেছেন। এসেছেন দৃষ্টিহীন নিঃস্ব ধৃতরাষ্ট্র, বিদুর, সঞ্জয়, বেদব্যাস।

এবং কুন্তীও।

অভিমন্যু, ঘটোৎকচ, ইরাবান, দ্রৌপদীর পাঁচ পুত্র, শল্য, দুর্যোধন, আচার্য দ্রোণের মৃতদেহ দেখে, কুন্তী এসে দাঁড়িয়েছেন সেই ছিন্নশির মৃতদেহটির সামনে। মৃতদেহটি পূর্ণাবয়ব নয়। দুদুটো রাত সে দেহে দাঁত বসিয়ে গেছে মাংসলোভী শ্বাপদের দল। ছিন্ন

মস্তকটি পাশেই ভূলুণ্ঠিত। জমাটবাঁধা রক্ত। চোখ দুটি খোলা। সেই চোখ হাসছে। সেই চোখে পরম-পাওয়ার তৃপ্তি। এতটুকু ক্ষোভ নেই, বিদ্বেষ নেই, যন্ত্রণা নেই। আর সেই চোখের তারায় অন্যের-অজানা-হরফে শুধুই এক বৃদ্ধা রমণীর জন্য ফুটে রয়েছে একখানি পত্র ঃ জননী আমার, সেদিন নির্মম প্রত্যাখ্যানে আপনাকে ফিরিয়ে দিয়েও নিজেকে ফেরাতে পারি নি আমি। তাই এই প্রায়শ্চিত্ত আমার। কথা রেখেছি আমি, পঞ্চপুত্রেরই জননী আছেন আপনি। আমার পরম স্নেহের সহোদর অর্জুনকে রেখে গেলাম। তার মধ্যে আমাদের দুজনকেই খুঁজে পাবেন আপনি। আমার জীবন-দেওয়া শ্রদ্ধা আর প্রণাম রেখে গেলাম আমার রক্ত-ধারায়। আপনার অবাধ্য সন্তান, সব-পেয়েও সব-হারানো হত-ভাগ্য কর্ণ।

পত্রটি নির্ভুল পড়ে নিলেন কুন্তী। প্রায়শ্চিত্ত? প্রায়শ্চিত্ত কার? ওরে কর্ণ, পুত্র আমার, প্রায়শ্চিত্ত আজ কার?

পাঁচ পাঁচটি পুত্রকে রণক্ষেত্রে পাঠিয়েও পুত্রহারা হন নি, এমন নারী এখন এই কুরুক্ষেত্রে মাত্র একজনই ঃ কুন্তী। কিন্তু না, পুত্রহারা তিনিও। পুত্র-না-হয়েও পুত্রের-অধিক এক সন্তানকে হারিয়েছেন কুন্তী। অর্জুনকে রেখে, চলে গেছে কর্ণ। কুন্তী কাঁদছেন না। অশ্রুর অফুরান উৎস আজ শুষ্ক বনভূমি।

যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে জ্বলে উঠল অসংখ্য চিতা। আনা হল অগুরুচন্দন, কুংকুম, ঘৃত, তৈল, পট্টবস্ত্র, চন্দনকাঠ। শেষ-আগুনে অগণিত বীর। নারীদের করুণ আর্তনাদ। শোকের অবাধ বহিঃপ্রকাশ। সামগানের সুর। ঋক্‌মন্ত্রের উচ্চারণ।

দাহ শেষ। এখন শুধুই চিতাভস্মে উড়ে যায় অস্তিত্বের অবশেষ, উড়ে যায় উদাসী হাওয়ায়, পৃথিবীর শাশ্বত ইতিহাসে, দিগন্তের সবুজ সীমায়, শত শতাব্দীর নীল অন্ধকারে।

এবার তর্পণ। শেষ শ্রদ্ধাঞ্জলী। ধৃতরাষ্ট্রকে সামনে রেখে সকলে এগিয়ে চললেন পুণ্যসলিলা ভাগীরথীর দিকে। যাবতীয়

ভূষণ আর উত্তরীয় পরিত্যাগ করে সোপানসারি বেয়ে জলরাশির বুকে পেঁছিনো।

স্নান। ধুয়ে যাক সব পাপ, জাহ্নবীর পুণ্য স্রোতধারা মুছে দিক জমে-ওঠা কলঙ্কের যতকিছু দাগ।

তর্পণ। দুহাতের বন্ধনীতে জল আর জলের বুকে জলেরই অঞ্জলী আর মৃতদের শান্তিকামনা।

জাহ্নবীর জলরাশিতে দাঁড়িয়ে আছে যুদ্ধজয়ী পঞ্চপুত্র। হাতের মুঠোয় আয়ুধ নেই, আয়ুধের স্থান নিয়েছে হেমন্তের হিমঝরা স্নিগ্ধ জল, তর্পণের, শোকনম্রতার।

ধীরে ধীরে সোপানসারি বেয়ে জলের কিনারে এসে দাঁড়ালেন কুন্তী। এতটুকু চাঞ্চল্য নেই, লাজ নেই, কোথাও অভাব নেই শব্দের। কুন্তী এখন দ্বিধাহীন, নিঃসংশয়।

ভাগীরথীর তীরে উপস্থিত অসংখ্য মানুষ শুনল এক নারীর স্পষ্ট উচ্চারণ। পঞ্চপুত্রকে সম্বোধন করে কুন্তী বললেন—বৎস, যে মহাবীর যুদ্ধে নিহত হয়েছেন অর্জুনের হাতে, যাকে তোমরা এতদিন উল্লেখ করতে সূতপুত্র বলে, অসংখ্য সৈন্যের মাঝে যে ভাস্বর হয়ে জেগে থাকত সূর্যের মতো, যার তুল্য বীর আজ পর্যন্ত জন্ম নেয় নি এই পৃথিবীর মাটিতে, জীবনের সব মায়া ত্যাগ করে যে সাধনা করত অমরত্বের, সেই সত্যনিষ্ঠ মহাবীর কর্ণের তর্পণ তোমাদেরই করতে হবে।

ভাগীরথীর তীরে হু-হু হাওয়ার ডানা ঝাপ্‌টানো ছাড়া কোথাও কোন শব্দ নেই। প্রতিটি মানুষের বিস্মিত দৃষ্টি কুন্তীর দিকে। এ কী আশ্চর্য উক্তি পান্ডবজননীর! তাঁর পুত্রদের চিরশত্রু কর্ণকে তিনি আজ ভূষিত করছেন এত বড় মর্যাদায়!

অবিশ্বাসের জিজ্ঞাসাস্ফুটল যুধিষ্ঠিরের কণ্ঠে, এ কী বলছেন, মাতা! সূতপুত্র কর্ণের তর্পণ করব আমরা? কেন মাতা?

কারণ—কুন্তীর কণ্ঠস্বরে জড়তার লেশমাত্রও নেই—কারণ কর্ণ সূতপুত্র নয়। কর্ণ কৌন্তেয়, কর্ণই প্রথম পার্থ। কুমারী

অবস্থায় আমারই গর্ভে জন্ম নিয়েছিল সে। লোকলজ্জায় সেদিন তাকে পরিত্যাগ করেছিলাম আমি। কিন্তু আজ আর ত্যাগ করতে পারি না। সে আমার প্রথম সন্তান, তোমাদের আপন অগ্রজ। তার তর্পণ করা তাই তোমাদের পবিত্র কর্তব্য।

হু-হু হাওয়ার দলও বুঝি থমকে গেল বিস্ময়ে। প্রত্যেকে স্তব্ধ। যুধিষ্ঠির আকুল। অর্জুন অনুশোচনায় আলোড়িত ঃ নিরস্ত্র অগ্রজকে হত্যা করেছেন তিনি। বৃদ্ধ বিদুরের চোখ তাঁর এতদিনের পরিচিতা রমণীটির মুখে নির্বাক বিস্ময়ে স্থির ঃ ঐ নারী তাঁর সত্যিই পরিচিতা, নাকি জীবনের এই সুদীর্ঘ প্রহর পেরিয়ে এসে আজও অচেনা, অপরিচিতা ?

ব্যতিক্রম শুধু একটি মানুষ। থরোথরো বিস্ময়ে, অবিশ্বাসে, অবুঝ জিজ্ঞাসায় প্রথমে তিনিই কেঁপে উঠেছিলেন সবার থেকে বেশি। কারণ তিনি জানেন, এই মুহূর্তে স্বয়ং কুন্তী বাদে একমাত্র তিনিই জানেন, কর্ণ কৌন্তেয় নন, কুন্তীর গর্ভে কোন-দিনই মাথা তোলে নি তাঁর জীবনের বীজ। তারপর ধীরে ধীরে মানুষটির মুখ জুড়ে ছড়িয়ে পড়ল শ্রদ্ধা আর কারুণ্যে দীপ্ত এক আশ্চর্য হাসি। কুন্তীকে বুঝেছেন কৃষ্ণ।

কর্ণের উদ্দেশে তর্পণ করলেন পঞ্চপাণ্ডব। যুধিষ্ঠিরের নির্দেশে নিয়ে আসা হল কর্ণের পত্নীদের। এতদিনের অজানা শ্বশ্রূমাতার সামনে এসে দাঁড়ালেন কর্ণপত্নীরা। হাতটা শুধু একটু উঠল কুন্তীর, মুখে উচ্চারিত হল না কোন আশীর্বচন।

কর্ণপত্নীদের সঙ্গে মিলে কর্ণের ঔর্ধ্বদেহিক কাজকর্ম সমাপন করলেন পঞ্চভ্রাতা।

সব কাজ শেষ। এবার হস্তিনাপুরে ফেরার পালা। না, ইন্দ্রপ্রস্থে নয়, হস্তিনাপুরে। সব দ্বন্দ্বের চরম মীমাংসা হয়ে গেছে আঠারো দিনের যুদ্ধে। ধৃতরাষ্ট্র আর রাজা থাকবেন না, থাকবেন সম্মানভাজন আশ্রিত হয়ে। ইন্দ্রপ্রস্থসহ অখণ্ড হস্তিনাপুরের রাজপদে এবার অভিষিক্ত হবেন যুধিষ্ঠির।

জীবনের সব স্বপ্ন আদ্যোন্ত সার্থক আজ। অথচ সেই সার্থকতার কোন স্বাদ আর খুঁজে পাচ্ছেন না কুন্তী। জীবনের বহু-বাঞ্ছিত সর্বোচ্চ শিখরটিতে আরোহণ করার পর প্রতিটি মানুষই বোধহয় অনুভব করে—আসলে কোথাওই ওঠা হয় নি। বা, এই শিখর বোধহয় তার সেই জীবনজোড়া আকাঙ্ক্ষার শিখর নয়।

ফিরে চলেছেন কুন্তী। স্বার্থকতার স্বাদ নেই, আছে শুধু এক নতুনতর উপলব্ধি ঃ এ-ই সে! এইমাত্র যে মৃত সৈনিকটিকে তিনি দিয়ে এসেছেন মরণোত্তর স্বীকৃতি, এ-ই সে, সেই অশ্বনদীর করাল স্রোতে ভেসে যাওয়া প্রথম সন্তান। বাস্তব যা-ই বলুক, যুক্তি তাকে স্বীকার করুক বা না-ই করুক, কুন্তীর সমস্ত সত্তা, সমগ্র অন্তর-চেতনা-মাতৃহৃদয় ঘোষণা করছে উচ্চকণ্ঠে ঃ কর্ণই সেই সন্তান অথবা সন্তানেরও অধিক, সন্তানের থেকেও অমূল্য কোন অনাবিষ্কৃত সম্পদ।

মহাকাল দেখছেন। চোখে তাঁর প্রশ্রয়ের হাসি। পুত্রস্নেহে অন্ধ হে নারী, জীবনের যতকিছু মালিন্য, গ্লানি আর পাপের সাগর পার হয়ে আজ তুমি উত্তীর্ণ হয়েছ সেই চরম মহত্ত্বে, যে মহত্ত্ব মানুষকে পৌঁছে দেয় এক জ্যোতির্ময় আলোর জগতে। কর্ণের চিতার আগুনে নিজের সবকিছু পুড়িয়ে, তাকে ঐ মরণোত্তর স্বীকৃতিটুকু দিয়ে, আজ তুমি এসে দাঁড়িয়েছে সেই জ্যোতির্ময় জগতের দুয়ারে। অনন্ত দহন আর অনন্ত সহন, এরই নাম তো জীবন। অনন্ত আত্মদহনের অবসানে, আজ তুমি চিরজীবী, চিরন্তনী, পৃথিবীর শাশ্বত নারী।

১৫

কুন্তীকথা শেষ হতে পারত এখানেই। কিন্তু শেষের পরেও রেশ থাকে আর তাই এখনও খুঁজতে হয় বুঝতে হয় চলতে হয়।

কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ শেষ হওয়ার পর পনেরটা বছর অতিক্রান্ত। ক্লান্ত, অন্ধ, সর্বস্বান্ত ধৃতরাষ্ট্র এতদিনে পৌঁছে গেছেন মানসিক

ক্ষয়ের শেষ সীমায়। হস্তিনাপুরের একদা-শাসক আজ অন্যের অন্নদাস। মুক্তি পেতে চাইলেন ধৃতরাষ্ট্র। বনবাসে চললেন তিনি। সঙ্গী হলেন গান্ধারী।

সেদিন কার্তিকী পূর্ণিমা। হস্তিনাপুর সেদিন বিষাদনগরী। ধৃতরাষ্ট্রের অনুগমন করছেন পঞ্চপাণ্ডব, কৃপাচার্য, যুযুৎসু, ধৌম্য, বিদুর, সঞ্জয়, দ্রৌপদী, সুভদ্রা এবং কুন্তী। বদ্ধনেত্রা গান্ধারীর একটি হাত নিজের কাঁধে নিয়েছেন কুন্তী।

কিছুদূর এগোনোর পর কুন্তী যুধিষ্ঠিরকে জানালেন তাঁর সিদ্ধান্তটির কথা, যা তিনি ভেবে রেখেছিলেন অনেক আগেই। বললেন, বৎস, তোমরা ফিরে যাও। আমিও ওনাদের সঙ্গে বন-গমন করব।

পঞ্চপুত্র স্তম্ভিত। এতদিনের কষ্টার্জিত রাজ্যসুখ ছেড়ে রাজমাতা কুন্তী এই শেষ বয়সে আবার বনবাসী হবেন?

নানাভাবে কুন্তীকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করলেন যুধিষ্ঠির, ভীমসেন, দ্রৌপদী। ধৃতরাষ্ট্রের অনুরোধে কুন্তীকে নিষেধ করলেন গান্ধারীও। কুন্তীর লোলচর্ম মুখে আনন্দময় হাসি। যুধিষ্ঠিরকে তিনি বললেন, বৎস, সহদেবের প্রতি একটু বিশেষ দৃষ্টি রেখো। দ্রৌপদীর সঙ্গে কখনও অপ্রিয় আচরণ কোরো না। ভীমসেন, অর্জুন আর নকুলের রক্ষণাবেক্ষণ কোরো। আজ থেকে এই কুরুবংশের সবটুকু দায়িত্ব অর্পিত হল তোমার ওপর। আর হ্যাঁ, কর্ণকে মনে রেখো। তোমাদের সকলের স্মৃতিতে যেন চিরদিন উজ্জ্বল হয়ে থাকে সে। কল্যাণ হোক তোমাদের।

চলে যাচ্ছেন ধৃতরাষ্ট্র, গান্ধারী। চলে যাচ্ছেন কুন্তী। অতি-বৃদ্ধ মানুষটি আজও নিজেকে ফেরাতে পারলেন না সেই প্রথম-দেখা দুটি চোখের দুর্বার আকর্ষণ থেকে। কাজেই, বনবাসে চললেন বিদুরও। তাঁর সঙ্গী হলেন সঞ্জয়।

গঙ্গায় স্নান করলেন সকলে। সমাপন হল সন্ধ্যাবন্দনা। বেদীতে বসে হুতাশনে আহুতি দিলেন ধৃতরাষ্ট্র। দেখা হল বেদব্যাসের

সঙ্গে, রাজর্ষি শতযূপের সঙ্গে। বাণপ্রস্থের নানান বিধির শিক্ষা দিলেন শতযূপ।

প্রায় এক বছর পর তপোবনে এসে উপস্থিত হলেন পঞ্চপাণ্ডব, দ্রৌপদী, পাণ্ডবভ্রাতাদের অন্যান্য স্ত্রীরা, অভিমন্যুজায়া উত্তরা, ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রবধূরা, অন্যান্য কৌরব বিধবারা। স্নানান্তে পুষ্প-চয়ন করে জলপূর্ণ কলস নিয়ে তখন নদী থেকে আশ্রমে ফিরছেন বনবাসীরা, শুধু বিদুর অনুপস্থিত। আকুল কান্নায় ভেঙে পড়ে কুন্তীর পায়ে আছড়ে পড়লেন সহদেব। সকলকে সান্ত্বনা দিলেন কুন্তী। আশীর্বাদ করলেন ধৃতরাষ্ট্র আর গান্ধারী। যুধিষ্ঠির প্রশ্ন করলেন, তাত বিদুর কোথায়? তাঁকে দেখছি না যে!

ধৃতরাষ্ট্র বললেন, বৎস, আমার সেই প্রজ্ঞাবান অনুজ আহার পরিত্যাগ করে শুধুমাত্র বায়ুভক্ষণ করে এই অরণ্যের গভীর প্রদেশে কঠোর তপস্যা করে চলেছে। এ অঞ্চলের ব্রাহ্মণরা কখনও কখনও তাকে বনের গভীরে দেখতে পান।

ঠিক এমনি সময়েই আশ্রমের দিকে আসছিলেন বিদুর। জটাধারী, শীর্ণদেহ, সম্পূর্ণ নগ্ন, ধূলিধূসরিত। আশ্রমে লোকজন দেখেই বনের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেলেন বিদুর। পিছনে পিছনে এগিয়ে গেলেন যুধিষ্ঠির, ডাকতে লাগলেন, তাত, আমি যুধি-ষ্ঠির, আপনার পরম প্রিয় যুধিষ্ঠির আমি।

অনেকটা এগিয়ে থমকে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠির। সামনেই একটি গাছের গায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন বিদুর। অস্থিচর্মসার। কথা বলার শক্তিটুকুও নেই। চরম অবসাদে ধুঁকছেন প্রাজ্ঞ মানুষটি।

বিদুরের একেবারে সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন যুধিষ্ঠির, ব্যাকুল স্বরে বলে উঠলেন, আমি এসেছি, তাত। আমি যুধিষ্ঠির।

চোখ মেললেন বিদুর। সেই চোখে কোন দৃষ্টি নেই। হয়ত অনুভবে একবার কুন্তীপুত্রটির অস্তিত্ব ছুঁতে চাইলেন বিদুর। তারপর সাড়া দিলেন কোন দূর-সুদূরের শেষ ডাকে। শরীরটি

দাঁড়িয়েই রইল গাছে ভর দিয়ে। চোখ দুটি খোলা। সে চোখ দীপ্তিহীন। নিভে গেল কুন্তীর জীবনের শেষ নীলাভ আলো-টুকু।

তপোবনে কিছুদিন বাস করে হস্তিনায় ফিরে এলেন দর্শনার্থীরা। এলেন না শুধু কয়েকজন। কিছু কৌরববিধবা প্রাণ-বিসর্জন দিলেন নদীর জলে।

দিন গেল, রাত গেল। অনেক দিন, অনেক রাত। পুরো দু বছর। আজ থেকে ঠিক আঠারো বছর আগে নিভে গেছে কুরুক্ষেত্রের মহাযুদ্ধের আগুন।

কিন্তু অন্য-এক আগুন এখনও প্রতীক্ষায় ছিল। ছিল ধৃতরাষ্ট্র-গান্ধারীর বুকে, সঞ্জয়ের মননে আর কুন্তীর গহন চেতনায়। যে আগুন দগ্ধ করে, চেতনার প্রতিটি বিন্দু পুড়িয়ে পুড়িয়ে যে অনল জন্ম দেয় খাঁটি সোনার।

পুড়ে চলা, পুড়তে থাকা।

আর কখন যেন সে আগুন ছড়িয়ে পড়ে প্রকৃতির বুক জুড়ে, তার ভয়ংকর অথবা রমণীয় তাথৈ-নাচন ঘিরে ফেলে বাস্তবের অস্তিত্বকে। সামনে এসে দাঁড়ায় সত্যিকারের আগুন।

এই দু বছর কঠোর তপস্যা করেছেন ধৃতরাষ্ট্র। গান্ধারী বেঁচে আছেন শুধু জলপান করে। কুন্তী আহার গ্রহণ করেন মাসে একদিন। আর সঞ্জয় আহার করেন পাঁচ দিন অন্তর। কয়েকজন যাজক থাকেন আশপাশে। যজ্ঞের হুতাশনে আহুতি দেন তাঁরা।

সেদিন গঙ্গাস্নান করে আশ্রমে ফিরছিলেন ধৃতরাষ্ট্র। সঙ্গী গান্ধারী, কুন্তী, সঞ্জয়। হঠাৎ পাশ দিয়ে ছুটে গেল কিছু বন্য-বরাহ। চারপাশে যেন প্রচণ্ড উত্তাপ।

আর্তনাদ করে উঠলেন সঞ্জয়, মহারাজ, দাবানল! দাবানল ধেয়ে আসছে আমাদের দিকে!

ক্লান্ত চোখ দুটি তুলে চারপাশে তাকালেন কুন্তী। হ্যাঁ, বনভূমিতে আগুন লেগেছে। ধেয়ে আসছে দাবানল। প্রচণ্ড হল্কা। বন্যবরাহের দল লাফিয়ে পড়ছে জলাশয়ে। অসহায় পুড়ে যাচ্ছে বুটিদার মায়াতী হরিণ, বুকে-হাঁটা ভুজঙ্গের দল। তাদের আর্ত ছুটোছুটিতে কী গভীর জীবনতিয়াসা! বেঁচে থাকা, বেঁচে থাকা। এই ধরিত্রী, তার জল-মাটি-হাওয়া, স্নেহ-প্রেম-মমতা, পাপ-পুণ্য-প্রায়শ্চিত্ত আর অবিরাম খুঁজে চলা খুঁজতে থাকা—যোগফল জীবন। আর জীবনের ছায়া হয়ে নিয়ত সঙ্গে ফেরে সেই আতঙ্কের অথবা আকাঙ্ক্ষার দোসর, মানুষ যাকে চিহ্নিত করেছে মৃত্যু নামে।

তাহলে, আসছে সে! পরম তৃপ্তিতে শ্বাস নেন কুন্তী। বনজ বাতাসে এখন আগ্নেয় উষ্ণতা।

সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, দ্রুত চলুন। চেষ্টা করলে এখনও হয়ত রক্ষা পাওয়া যাবে।

বৃদ্ধ ধৃতরাষ্ট্র, অনাহারে-উপবাসে শীর্ণ, অশক্ত ধৃতরাষ্ট্র বললেন, না সঞ্জয়, দ্রুত চলার শক্তি আমার আর নেই। বরং স্থির হয়ে মৃত্যুর প্রতীক্ষা করাই ভাল। করুণাময় ঈশ্বর আমার যন্ত্রণার অবসান ঘটানোর জন্যই তাঁর দূত করে পাঠিয়েছেন এই দাবানলকে।

গান্ধারীর দিকে তাকালেন সঞ্জয়। দু'চোখ আজও অনচ্ছ বস্ত্রে আচ্ছাদিত, শরীর অস্থিচর্মসার। না, যেতে পারবেন না গান্ধারীও। সঞ্জয় নিজেও আজ বৃদ্ধ, দুর্বল। কাউকে বহন করার শক্তি তাঁরও নেই। অসহায় সঞ্জয় কুন্তীর দিকে তাকালেন। দুটি হাত জড়ো করা বুকের কাছে। আগুনের দিকে মুখ রেখে দাঁড়িয়ে আছেন পাণ্ডবজননী। সেই মুখ আনন্দময় হাসিতে উদ্ভাসিত, দুই চোখে আবাহনের অনুচ্চারিত মন্ত্র। কন্যা নন, জায়া নন, প্রিয়া নন, এমনকি জননীও নন, শুধুই এক মানবী, সুদূর-পিয়াসী।

আকুল কণ্ঠে সঞ্জয় বললেন, মহারাজ, যে যজ্ঞীয় অনল আপনি পরিত্যাগ করেছিলেন, সেই অনল যাজকেরা ফেলে এসেছিলেন বনের গভীরে। সম্ভবত সেই অনলই ধীরে ধীরে দাবানলের রূপ নিয়েছে।

গান্ধারী হাসলেন, যেভাবেই হোক না কেন সঞ্জয়, এতদিনে তো আসছে সে। আসতে দাও তাকে।

সঞ্জয় আবার বললেন, বলুন মহারাজ, এখন কী কর্তব্য আমাদের ?

স্থবির, দৃষ্টিহীন মানুষটির গলা কাঁপল না এতটুকুও, বিদুর আগেই গেছে, সঞ্জয়। এবার আমাদের ডাক এসেছে। কিন্তু তুমি চলে যাও, সঞ্জয়। তোমার শরীরে এখনও কিছু শক্তি আছে আর তোমার শেষ প্রহর এখনও আসে নি। যাও সঞ্জয়।

চারপাশে তাকালেন সঞ্জয়। আগুনের বেড়াজাল এখন খুব কাছে, একেবারে মাথার শিয়রে। শ্বাসরোধী ধোঁয়া, অস্থিপোড়া অসহ উত্তাপ। স্খলিত পায়ে, টলতে টলতে, এগিয়ে গেলেন সঞ্জয়। শরীরে যেটুকু শক্তি ধিকিধিকি জেগে আছে আজও, সেটুকু সংহত করে সঞ্জয় পেরিয়ে গেলেন আগুনের মারণজাল। তবু অনিবার্য, গলাব্যথা পিছুটান। শেষবারের মতো পিছনে তাকালেন সঞ্জয়। ঐ দূরে, অগ্নিবৃত্তের মাঝে, তিনজন নরনারী, অথবা কঙ্কাল যেন, পূব দিকে মুখ রেখে বসে আছেন নিশ্চল। হয়ত গভীর ধ্যান, আগুন ভেদ করে কোন জ্যোতির্ময় রথের অভ্যুদয়ের সবঢালা প্রতীক্ষা।

সঞ্জয় এগিয়ে চললেন। গঙ্গাতীরে বসবাস করেন যে ঋষিরা, তাঁদের কাছে পৌঁছে দিতে হবে সংবাদটুকু, যাতে তাঁরা সংবাদ পাঠাতে পারেন হস্তিনায়—মহারাজ যুধিষ্ঠিরের কাছে। তারপর সঞ্জয়েরও ছুটি। হিমালয় ডাকছে তাঁকে।

কুন্তীর অস্তিত্বের সর্বত্র জুড়ে তখন আগুনের নটরাজ নৃত্য। কোথাও কোন দাহ নেই, সহ্যাতীত কষ্ট নেই। বড় মিষ্টি, বড়

স্নিগ্ধ, যেন হেমন্তের হিম অথবা অবিরাম তুষারপাত। তুষার-প্রতিম সেই আগুনে পুড়ছেন কুন্তী, পুড়ছেন, পুড়তে পুড়তে শুদ্ধ, শুদ্ধতার উত্তুঙ্গ শিখর, জ্যোতির্ময় সেই রথ···মহাকাল, হে অনন্ত, হে অসীমপ্রসারী মহাকাল, অবশেষে, অবশেষে তোমার করুণা, অপার, অথৈ করুণা···

প্রণমি তোমায়, মহাকাল।

—o—